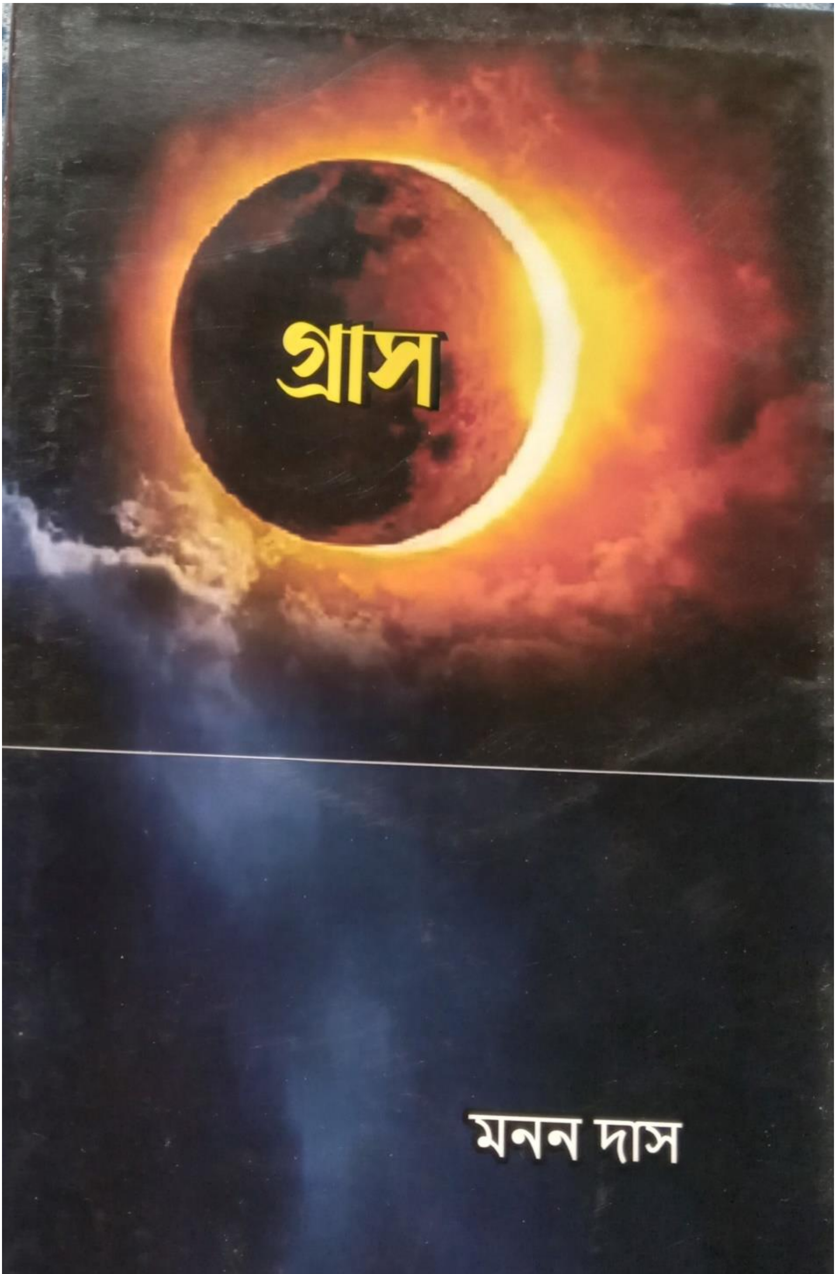

গ্রাস
মনন দাস

গ্রাস

মনন দাস

সৌরভ
গ্রন্থ প্রকাশ
বালী হাওড়া

GRAS

A Collection of short stories

By Manan Das

প্রকাশকঃ

বউল পাঁজা

৫৭/২, গঙ্গাকান্ত ভাদুড়ী স্ট্রীট,

বালী, হাওড়া, ৭১১২০১

মুদ্রকঃ বউল পাঁজা

প্রচ্ছদঃ ফটিক দাস

প্রথম প্রকাশ - আন্তর্জাতিক বইমেলা ২০২৫

মূল্যঃ দেড়শ টাকা

উৎসর্গ

অনুজ প্রতীম কবি অসীম দাস

স্নেহবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থঃ

উপন্যাসঃ

মনভূমি
মন এক উষ্ণ প্রস্রবণ
ঝলমলি
ছুট
গোবু গোবিন্দ

গল্প সংগ্রহঃ

অন্য স্বাদ
পঞ্চশ্বর
গল্প পঞ্চক
জীবন যাপন

কিশোর উপন্যাসঃ

রাজু নারাণের কীর্তি

ছড়ায় গল্পঃ

আটটা ঠাট্টা

কবিতাঃ

বন সবুজের মন (কবিতা সংগ্রহ, ১ম পর্ব)
স্থাবর অস্থাবর (কবিতা সংগ্রহ, ২য় পর্ব)

সূচীপত্র

গ্রাস

(রচনাকাল ১৯৭৬)

(এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক)

মহাশয়গণ, আপনাদের দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোন দুঃখ আপনাদের কখনো ছুঁতে পারেনি। আপনাদের মুখে কি উজ্জ্বলতা! আপনারা হাসছেন, অনবরত হাসছেন, হাসছেন আর কথা বলছেন। অনর্গল কথা বলছেন, এ ওকে বলছেন, ও একে বলছেন, কি যে বলছেন কে যে শুনছে এসব খেয়ালও করছেন না, শুধু মনের আনন্দেই বকছেন।

ওই কোনের দিকে আবার ট্রানজিস্টর রেডিও চালু হয়ে গেল। বাঃ! গানটা বেশ উত্তেজক, মনে হচ্ছে কোনো হিন্দি ছবির ক্যাবারে নাচের গান।

আহা, ওই একেবারে পিছনের লম্বা সীটে ছজন ছেলেমেয়ে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে দিলো। কি ব্যাপার? ও! ওরা খাবার ভাগাভাগি করে খাচ্ছে, খাচ্ছে আর কোথায়! কাড়াকাড়ি করছে আর সেই ছলনায় গায়ে গায়ে ঢলাঢলি করে সুখ সুখ খেলছে।

বেশ! বেশ! মহাশয়গন, এরকম আনন্দিত মানুষ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। সত্যি কথা বলতে কি আমিও ওরকম আনন্দ চাই, ওরকম প্রাণ খুলে হাসতে চাই। আর সে জন্যইতো আজকে আমি আমার তিন বন্ধুর সাথে বেরিয়েছি। চারদিন ধরে আমরা খুব ফুর্তিতে কাটাব। হাসব খেলব খাবো দাবো ছুটবো আর ছুটবো সমুদ্রের দীর্ঘ বেলাভূমিতে, ছুটে ছুটে হাঁফিয়ে ধুপ করে শুয়ে পড়ব ঝাউবনে, এক ঘন্টা দু'ঘন্টা যতক্ষণ ইচ্ছা সমুদ্রের জলে ঝাঁপাবো। সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালী মাছেরা নাকি ধরা পড়ে জেলেদের জালে, আমরা রোজ অনেক মাছ কিনব, মেদিনীপুরের খুব ভাল ভাল চাল নাকি সেখানে থৈ থৈ - আমরা রোজ ভাত রাঁধব - এইসব -

অনেক অনেক সুখের মতলব ভেঁজেছি দিনের পর দিন।

ওইতো, আমার বন্ধুদের দেখুননা - ওই যে ওদিকের সীটে তিনজন পাশাপাশি - দেখুন কিরকম গল্পে মশগুল! কথা বলছে না বক্তৃতা করছে রে বাবা! আসল ব্যাপারটা বুঝেছেন তো? ওদের সামনের সীটে জানলার ধারে বসেছে যে মেয়েটি ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে ওরা তিনজন হামলে পড়েছে। মেয়েটির পাশে বোধহয় ওর মা তারপর বাবা। বাবার হাতে দেখছি আমার খবরের কাগজটা। ধর্মতলার বাসস্ট্যান্ডে কাগজটা কেনা মাত্র কুন্তল ওটা হাতিয়েছিল, দেখুন কারবারটা, মেয়ের জন্য মেয়ের বাবাকে কুন্তল তেল দিচ্ছে।

মেয়েটা কিন্তু পাত্তাই দিচ্ছেনা, গালে হাত রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে, যেন পাথরের গা! মেয়েটাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার গা জ্বলে গেছে। ধর্মতলায় বাস যখন ছাড়ব ছাড়বে তখন ওরা এলো, তা মেয়েটার মুখে এত দেমাক! যেন মাটিতে পা পড়ছিল না। আসলে ও বোঝে যে ওর সুন্দর মুখটার দিকে সকলে তাকাচ্ছেই। তাতে কি হয়েছেরে বাবা! সহজ ভাবে সকলের দিকে তাকালে তোমার চোখ কি ক্ষয়ে যাবে? সব সময় নিজের দিকেই তাকিয়ে আছে। এই মেয়েটার জন্যে ওরা তিনজন এমন হ্যাংলামি করছে! দেখে মনে হচ্ছে মারি ওদের পেছনে তিন লাথি।

মহাশয়গন, আমার বন্ধু তিনজন ও আপনারা সকলে যে এমন উৎফুল্ল এতে আমি খুশি হতে চেষ্টা করছি। বস্তুত আনন্দ পৃথিবীতে খুবই দুর্লভ বস্তু। কিন্তু মহাশয়গন, আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আপনাদের প্রত্যেকের অমন উজ্জ্বল মুখ দেখে আমি ভেতরে ভেতরে জ্বলে যাচ্ছি। কেন বলুনতো? এজন্য, যে আমি একটুও আনন্দ পাচ্ছি না, অথচ আমি চাইছি।

আসলে আমার জীবনের প্রত্যেকটা দিন ভীষণ থোঁতাভোঁতা একঘেয়ে আর নানান রকম উঞ্ছবৃত্তিতে ভর্তি। তাও আবার এইসব ছোট ছোট উঞ্ছবৃত্তির জন্য এই চৌত্রিশ বছর বয়সে আমাকে নানান মতলব আঁটতে হয়,

নানা ফন্দিফিকির খাটাতে হয়, তবে দুটো পয়সা –

নাঃ, আমি দেখছি মনে মনে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করে দিয়েছি। আপনারা যখন আনন্দে মশগুল হয়ে এই দ্রুতগামী বাসে হুসহুসিয়ে ছুটে চলেছেন তখন কিনা আমি নিজে একটা গোঁত্তা খাওয়া লোচ্চা আপনাদের আনন্দ দেখে জ্বলেপুড়ে খাক হচ্ছি আর -

এই যে আমার পাশে বসে আছে ছোট ছেলেটা - বাসে উঠে বসা পর্যন্ত আমি বুঝতে পারছি ওর ইচ্ছা জানলার ধারে বসে, কিন্তু আমি যেরকম মুখ থ্যাবড়া করে বসে আছি যে ওর সাহসই হচ্ছে না আমাকে মুখ ফুটে বলবার। কিন্তু আমারই তো বলা উচিত। না মহাশয়গন আমার অতো বদান্যতা নেই। আমি পৃথিবীতে এসে এযাবৎ দুহাত ভরে - চুলোয় যাক - সামান্য কতটুকু সুখটুখ পেয়েছি যে আবার অপরের সুখ দেখব? সামান্য ব্যাপারই দেখুন, ওই যে আমার বন্ধুরা - দেখুন কেমন খুশিতে মশগুল - একবারও আমার কথা ভাবছে যে আমি কেমন একা পড়ে গেছি, অথচ ওরা কি জানেনা এভাবে একা আমি ক্রমশঃ আরও ডুবে যাই গভীর কষ্টের মধ্যে....

এখন আমার সবচেয়ে রাগ হচ্ছে অনিমেষের ওপর। ও শালা টিকিট কাটিয়ে নিয়ে গেছে এক সপ্তাহ আগে, জেনে গেছে সীটের কিরকম ব্যবস্থা - কোন সীটটা জানলার ধারে। সকালবেলা ধর্মতলায় এসে বাসে উঠে দেখলাম বাসের একদিকে তিনজন করে আরেক দিকে দুজন করে বসার সীট্, মাঝখানে সরু পথ। অনিমেষ ব্যাটা জানে, চট করে তিনটে সীটের একটা লাইনে ঢুকে পড়ে জানলার ধারে বসে পড়ল আর আমাকে ইসারা করল উল্টো দিকের এই জানলার ধারের সীটটা দখল করার জন্য। আমি এক নম্বরের আহাম্মক, চটপট বসে পড়লাম, কুন্তল আর পরিমল খানিকটা চেঁচামেচি করে শেষটায় অনিমেষের পাশেই বসতে বাধ্য হলো, কিন্তু কাঁচকলার কাণ্ড দেখো, আমি আহাম্মক কেমন থ্যাবড়া মুখে বসে আছি আর

আমার মধ্যে বেড়ে উঠছে যন্ত্রণা। আঃ, আমি কিচ্ছু দেবোনা, কাউকে না, কিচ্ছু না। এই ছোট ছেলেটাকে জানলার ধারে বসার সুখটুকুও আমি ছেড়ে দোবোনা। আমার জন্য কে কি ছেড়েছে? আমি আমার এই চৌত্রিশ বছরের জীবনে কি পেয়েছি? আমাকে রোজ লোচ্চাগিরি করতে হয়, নানান ফন্দিফিকির করতে হয় দু-পাঁচটা টাকার জন্য।

মহাশয়গন, আসলে আমার কপালে সুখটুখ নেই। অথচ আমার তেষ্টাটা পুরোপুরি আছে। হ্যাঁ মহাশয়গণ, আমি কপালের কথা বলছি। আপনারা বিশ্বাস করুন আমি ভীষণ কপালটপাল মানছি। আগে মানতাম না। যখন আমি বি. এ. দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র তখন আমার কি তেজ! তখন আমার এরকম মনে হতো - আমার মস্তিষ্ক আমার বাহুবল আমার মনঃশক্তি আমার বুদ্ধিমত্তা এসবই সব। এসব দিয়েই আমি এগিয়ে যাব জীবনে। শুধু এগিয়ে যাওয়া নয়, সকলকে পথ দেখাব সুস্থ সুন্দর জীবনের। আমি ভাবতাম আমার দেশের লোকেরা বড় ভীরু, বড় ভাগ্য বিশ্বাসী। তাদের চেতনা আনতে হবে, বোঝাতে হবে এ পৃথিবীতে সকলের সমান অধিকারের কথা। হ্যাঁ মহাশয়গন, আমি এরকম ভাবতাম - আমি এগিয়ে যাবো সকলকে নিয়ে, পথ দেখাবো - নতুন পথ - নতুন দিন - নতুন এক সময়ের দিকে আমরা এগিয়ে যাবো। তখন আমার ভীষণ তেজ। কলেজের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে আমি যখন বক্তৃতা দিতাম তখন কলেজের হাজারো ছেলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমার কথা শুনতো। তখন আমার সহপাঠীরা আমাকে আর বন্ধু ভাবতে পারতো না, আমাকে শ্রদ্ধা করত, আমার বক্তব্যকে ধ্রুব মনে করত, আমার অনুগামী হওয়া প্রয়োজন মনে করত...

কিন্তু কিছুই হলোনা। মহাশয়গন, সেই একই ভাবে সবকিছু চলছে আর আমি ক্রমশঃ পেছোতে পেছোতে - আঃ - আমি জানতাম না জীবনে এত পেছোনা যায়...

আমি এখন খুব কপালটপাল বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি আমার কপাল

খারাপ তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের এতগুলো সার্টিফিকেট জমিয়েও আমার চাকরি হলোনা। চাকরি হলোনা তাই জীবনে আর কিছুই হলোনা। হলোনা কারণ ভাগ্য খারাপ। ভাগ্য ভালো হলে চাকরি হতো, বউ হতো, সাজানো ঘরে সুখগল্প, ছুটির দিনে মনমতো বাজার, সুখাদ্য পরিপাটি, সিনেমা....

সত্যি আমার কপাল খারাপ, আমার শুধু নয়, এই দেশটার অধিকাংশ লোকেরই কপাল খারাপ। আসলে এই দেশটারই কপাল খারাপ, তাই সবাই খুব ভাগ্যটাগ্য মানে। এই সত্তর দশকে কলকাতায় কত শনিমন্দির বেড়েছে দেখুননা। শনিবার সেই পুজোর থালায় কত পয়সা জমে। আমিও আজকাল প্রত্যেক শনিবার পুজোর থানে ধূপ কিনে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি, আর দুটো পয়সা দক্ষিণা দিয়ে প্রার্থনা করি - না মহাশয়গণ চাকরির প্রার্থনা আর করিনা, ওটা দুবছর আগে পর্যন্ত করতাম, তখনো কিছু আশা ছিল, ছিল বললে ভুল হয় - আশা হয়েছিল, কারন এম.এল.এ দাদা বলেছিলেন - তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই।

কিন্তু ওই পর্যন্তই! কিছুই হলোনা। তবে কদিন আগে এম.এল.এ দাদা খুব খাতির করছিলেন, আবার বলছিলেন - পল্টু, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই! হ্যাঁ, শুনছতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন হবে বলেছেন, আমি চেষ্টা করছি এম.পি. আসনে দাঁড়াবার, তবে একটু বাধাটাধা পড়ছে, যাইহোক, দেখোনা এই নীলাটা কিনে ফেললাম, ভাস্করাচার্য বলেছেন এটা পরলেই আমি চড়চড় করে এগিয়ে যাবো, আর আমার এগোনো মানেই তোমার এগোনো, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করবই। তুমি ভোটের জন্য জান লড়িয়ে দাও।

মহাশয়গণ, আমি কিন্তু আর কাঁচা ছেলে নেই। ছিলাম, যখন কলেজে পড়তাম। আমি এখন ঘাঘু হয়ে গেছি। এক নম্বর লোচ্চা হয়ে গেছি, বললাম - ওসব কথা ছেড়ে দিন, নগদ কত ছাড়বেন বলুন। তা উনি ক্ষেপে অস্থির, হাতের নীলা ঝকঝকিয়ে বললেন - তুমি একথা বলতে পারলে পল্টু? আমার

দৌলতে তুমি করে খাচ্ছোনা?

হ্যাঁ মহাশয়গণ, ওনার দৌলতে আমি করে খাচ্ছি! রোজ সকালে উঠে ওনার বৈঠকখানায় চলে যাই তারপর যত দর্শনপ্রার্থী আসেন তাদেরকে পাকড়াও করি, কার রেশনকার্ড হচ্ছে না, এম. এল. এর সই চাই - চোখমেরে কানে কানে বলি - যতগুলি কার্ড হবে ততগুলি পাঁচ টাকার নোট - আমতা আমতা করলে তখন কড়া গলায় বলি - ফলস্ কার্ড তো করাচ্ছেন, বুঝিনা? যদি দিতে না পারেন কেটে পড়ুন, সই হবেনা - তখন সুড়সুড়িয়ে আদায় হয়ে যায়। তারপর ক্যারেকটার সার্টিফিকেট! আহা হা হা! অবশ্য এটার ব্যাপারে আমি দুটাকার বেশী আদায় করিনা - ছেলে ছোকরা! চাকরির জন্য লড়ে যাচ্ছে! এদের আমি একটু কন্সিডার করি। মার্কসিট, সার্টিফিকেট, এসবের কপি এ্যাটেষ্টেড করলে পয়সা লাগবেনা, শুধু ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটে দুটাকা। এরকম নানান সইসাবুদের ব্যাপারে কিছু আসে এছাড়া আছে গঙ্গার ধারে যত গোডাউনের মাসিক ব্যবস্থা। তা ব্যাটারা এটুকু দেবেনা? তোদের যে শালা চুরি-চামারি হচ্ছেনা, তার বেলা? আমি ইচ্ছে করলে দল ফিট করে দোবো লাখ টাকার মাল সাবড়ে দেবে, ঘরে বসে থোক টাকার ভাগ পেয়ে যাব, তখন?

তা এম. এল.এ দাদা আমার এসব জেনেও জানেন না, দেখেও দেখেন না, তা সেই ইঙ্গিতটাই করল। শালা গা জ্বলে গেল। তোমাকে এম.এল.এ করার জন্যে আমাকে কিছু কম করতে হয়েছে? আর তুমিতো গুছিয়ে একেবারে উপছে পড়ছ চাঁদ, তার বেলা?

ওঃ! আবে কুন্তল, আনন্দে যে একেবারে পাল খাচ্ছিস! একটু আস্তে বে একটু আস্তে! মেয়েটাতো তোদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেনা! কিন্তু আমার কাগজটা যে ভদ্রলোক একেবারে চেটেপুছে পড়ে নিচ্ছে! কেন? আমি কারোর জন্য একটু কিচ্ছু দোবোনা -

- এই কুন্তল, আমার কাগজটা দে - সে চিৎকার করে বলল রুক্ষ গলায়।

কুন্তল চমকে তাকাল। ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি কাগজ ভাঁজ করে তার দিকে এগিয়ে ধরে - আপনি পড়বেন? নিন।

ভদ্রমহিলা ও মেয়েটি ফিরে তাকিয়েছে, সে একবারও ওদের চোখে চোখ ফেলল না, মুখভাব আরও গম্ভীর করে বলল - না না, আপনি পড়ুন, আমি ভেবেছি আমার কাগজটা কুন্তল গুছিয়ে রেখেছে - বলতে বলতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো বাইরের দিকে।

বাসের গতি ক্রমশঃ কমে এসে থেমে গেল। ইঞ্জিন বন্ধ হলো, কন্ডাকটর সামনের সীট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল - বাস এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াবে, সামনে চা মিষ্টির দোকান টোকান আছে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন, কেউ এদিক ওদিক ঘুরতে যাবেন না, তাতে আমাদের দেরী হয়ে যেতে পারে। এখন নটা পাঁচ, আমরা ঠিক নটা পঁচিশে গাড়ি ছাড়ব। কথা শেষ না হতেই সবাই হৈ হৈ করে নামছিল।

বাস ফাঁকা হয়ে গেছে। এমনকি ড্রাইভারও নেই। জানলার বাইরে তাকাল সে - জায়গাটা বেশ সুনসান। রাস্তার ওপারে একটা বিশাল পুকুর, পাড়ে কয়েকটা নারকোল গাছ ইতস্ততঃ দাঁড়িয়ে, পুকুরের ওপারে ঝোপঝাড় আর গাছগাছালির জটলার ফাঁকে দুএকটি বাড়ির আভাস। রোদ্দুরে ডুবে আছে সব কিছু। সে শালটা গায়ে ভালো করে গুছিয়ে নিলো, সীট থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে দাঁড়াল, পাজামা ঝেড়ে ঠিকঠাক করল, দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

মিষ্টির দোকানে ভীড়ে ভীড়। একদিকে চা - আমায় একট - আমায় একটা - এরকম আওয়াজ আর হাত বাড়ানো। অনেকে দোকানের ভেতরে গিয়ে বসেছে, অনেকে প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে। দরজার দিকে এগোলো সে।

সেই মেয়েটি - দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। লাল শাল গায়ে জড়িয়েছে, বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করা, মুখ গম্ভীর, পুকুরের ওদিকে কোথায় যেন তাকিয়ে। দুপাশে দুটি চব্বিয় পঁচিশ বছরের ছেলে, সামনে দাঁড়িয়ে ওদের

মা। ভদ্রলোক শালপাতার ঠোঙা আর মিষ্টির ভাঁড় হাতে এগিয়ে এলেন।

সে পাদানিতে পা দিলো, সহসা মেয়েটির চোখ তার দিকে। সে মুখ কোঁচকালো এবং চোখ সরিয়ে নিলো, এদিক ওদিক তাকাল, সে তিন জনকে খুঁজছিল।

কুন্তল আর অনিমেষকে দেখল ওপাশের সিগারেটের দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে, কুন্তলের হাতে চার প্যাকেট ফিলটার উইলস্। ওরা সোজাসুজি এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির দিকে, তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। পরিমল খাবার হাতে দোকান থেকে বেরোচ্ছে। সে পায়ে পায়ে ওদের দিকে এগোলো।

অনিমেষ ওর দিকে দু-পা এগিয়ে এলো, চাপা গলায় বলল - কি ব্যাপার রে, ছেলে দুটো আর মেয়েটা তোর দিকে বারবার তাকাচ্ছিল কেন? যাঃ বাবা! আমরা কতক্ষণ থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আর তুই কি না টেনে নিলি? ছেলে দুটো তো তোর সামনের সীটে বসেছে, তুই বুঝি এরমধ্যে ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছিস?

সে কপাল কুঁচকে ছোট্ট করে বলল - না, তারপর এগিয়ে গেল পরিমলের দিকে, বলল কি কিনলি দে।

অনিমেষ ফিরে এসেছে, সিগারেটের একটা প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলল - মুখটা এমন পাঁচ করে রেখেছিস কেন? তুই যেন কি! বলে সে বিরক্তিসূচক কাঁধ ঝাঁকাল, ফুল হাতা সোয়েটারের হাতা দুটো টেনে টেনে ওপরের দিকে একটু তুলল, আঙুল মটকালো।

বাস পুনরায় ছুটছে। বাসের মানুষজন এখন অনেক চুপচাপ। সে সিগারেট ধরালো তারপর কাঁধের ঝোলাব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কিছু কাগজপত্র বার করল - লাইফ ইন্সিওরেন্সের নানা ধরনের লিফলেট - সেগুলি পড়তে মন দিলো।

পরিমল - কি ব্যাপার বলতো অনিমেষ, কদিন ধরে দেখছি ও

ইন্সিওরেন্সের কাগজপত্র নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করছে, কি জন্যে?
অনিমেষ উঁচু গলায় - ও একটা লাখ খানেক টাকার পলিসি করাবে। ওই যে ইন্সিওরেন্সের এজেন্ট - বসন্তদা - ওকে খুব ধরেছে - পল্টু, তুমি এত টাকা আয় করছ, কিছু ভবিষ্যতের জন্য জমাও - এই সব ধানাই পানাই গেয়ে ওকে গেঁথে ফেলেছে। তা বসন্তদা ধরেছে ঠিক লোককেই, ও তো আর দুপাঁচ হাজারের পলিসি করে হাত গন্ধ করবে না, লাখখানেক টাকার সহজেই করতে পারবে।

সে চোখ কুঁচকে এক দৃষ্টে অনিমেষের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, অনিমেষ চোখ ফিরিয়ে নিলো তারপর অন্য কথায় - আচ্ছা পরিমল, তোর কি ব্যাপার বলতো? আমার বাড়ির প্ল্যান আর ডিজাইনটা তুই কবে করে দিবি? তুই কি চাসনা আমি বাড়িটা করি?
পরিমল - প্লিজ অনিমেষ, আমি এত ব্যস্ত তুই জানিস না, অফিসে এখন এতো কাজের চাপ পড়েছে! একসঙ্গে এখন তিনটে মাল্টিষ্টোরেড বিল্ডিং এর কাজ আমার ওপর, এসব নিয়ে আমি হিমসিম খাচ্ছি, দেখিসতো, এক একদিন ফিরতে কত দেরী হয়। কোম্পানি আমাকে যেরকম টাকা দিচ্ছে সেরকম খাটিয়েও নিচ্ছে, যাই হোক, তোর ব্যাপারটা আমার মাথায় আছে, তাছাড়া তোর বাড়ির ডিজাইন - সেটা এমনই চমৎকার আর আইডিয়াল করতে হবে! - সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ে পরিমল, বলে - মাসখানেকের মধ্যে আমি একটু ফ্রি হবো তখন নিশ্চয় -
- দেখা যাক - অনিমেষ ঠোঁট ওল্টায় - মা এদিকে বিয়ের জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, বলছে বাড়িতো হবেই, কিন্তু এখন কি তুই গাছতলায় আছিস? কিন্তু আমার ইচ্ছে নয় ওই এজমালি বাড়ির ভাগের অংশে থেকে বিয়ে করি বুঝলিনা!
- নিশ্চয়, নিশ্চয়, প্রথম চার্মিং দিনগুলো বেশ রাজকীয় যদি না হয় – বলতে বলতে পরিমল উদার হাসে।

বন্ধুরা, আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি উনিশশো সাতাত্তর সালের ভোরে আমার যখন ঘুম ভেঙেছিল গায়ের ঢাকা ছুঁড়ে ফেলে লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমেছিলাম, মনে মনে বলেছিলাম - এইসব থোঁতাভোঁতা একঘেয়ে দিনগুলোর মুখে আমি লাথি মেরে চললাম। বুকের মধ্যে কি একটা উসখুসে ভাব ছটফট করছিল। আমি যত দ্রুত হাতে কাজকর্ম সারতে চাইছিলাম ততই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, তবু আমি সকলের আগে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলাম, ওদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাঁক দিয়েছিলাম। কিন্তু -

বন্ধুরা, তোমরা সত্যিই সুখী। যেটা আমি পেতে চেয়েছি কিন্তু পাইনি তোমরা পেয়ে গেছ। তোমরা কেমন হেসে খেলে মাতোয়ারা হয়ে আছো। ঠিক এমনটা তে আমিও চেয়েছি। আর সেজন্যই তো তোমাদের সাথে বেরোলাম, অথচ এখন আমার মাথার মধ্যে সেই পেরেক-মারা যন্ত্রণা, মুখটা তেতো বিস্বাদ। সারাক্ষণ আমার মনে হয় আমার মাথার বাঁদিকের পিছনে একটা পেরেক মারা আছে। কখনো কখনো এটা এত প্রবল হয়ে ওঠে মনে হয় একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ওখানটা চিরে দিই। জমে থাকা বদ রক্ত-টক্ত হয়ত জমে আছে, বেরিয়ে যাক, যন্ত্রণা কমুক। সারাক্ষণ আমার মুখের মধ্যে একটা বিশ্রী তেতো ভাব থাকে আর বুকের মধ্যে কি যেন যন্ত্রণা। আঃ, আমার মনে পড়েনা শেষ কবে আমি প্রাণ খুলে হেসেছি। এই ভাবেই চলছে। তবু মাঝে মাঝে কিরকম যেন মনে হয় নতুন করে বাঁচার, একটা অদম্য ইচ্ছা বুকের ভেতর ধাক্কা দেয়, মনে হয় একটা নতুন কিছু করি - করতে চাই - করতে যাই - তারপর ধাক্কা খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ি।

বন্ধুরা, আজ উনিশশো সাতাত্তর সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি সকাল বেলা যে উদ্দীপনা নিয়ে উঠেছিলাম মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সেই উদ্দীপনার মৃতদেহ আমাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে।

আজ সকালে কিন্তু আমার মাথার বাঁদিকে সেই পেরেক বেঁধা যন্ত্রণাটা ছিলনা।

অনেক অ-নে-ক দিন পর আজ মনে হচ্ছিল মাথাটা হালকা, মুখটা সুগন্ধপূর্ণ, আর বুকের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ ঝাঁপাচ্ছিল, কোথা থেকে আসছিল অদ্ভূত বাতাস, আমার শীত প্রায় লাগছিলই না।

তারপর আমরা ধর্মতলায় পৌঁছলাম। তখন কাতারে কাতারে মাবুষ আর মানুষ - আজ ছাব্বিশে জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস। কাতারে কাতারে লোক চলেছে প্যারেড দেখতে। মানুষ এত মানুষ দেখতে দেখতে আমার বুকের মধ্যে মাথা ঝাঁকিয়ে উঠল অমর, আমি স্পষ্ট দেখলাম সে মাথা ঝাঁকিয়ে কপাল থেকে চুল সরিয়ে চকচকে চোখে তাকাল, আমি একটা ঝাঁকুনি খেলাম আর আমার মাথার পিছনে পেরেকটা বিঁধে গেল।

কবছর আগে যেন? পাঁচ? ছয়? সেদিন আমি অমরকে নিয়ে এসেছিলাম, সেদিন ছিল ছাব্বিশে জানুয়ারি - তাকে আমি দেখাতে এনেছিলাম ঝকঝকে তকতকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বিশাল সৈন্যবাহিনীর মাত্র সামান্য অংশের ঝন্ ঝনা। সে আমার ভাই, সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে নেমেছিল। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম, বলেছিলাম - তুই ভুল করছিস, এ পথ ঠিক পথ নয়। সে বলেছিল - তবে কোন পথ ঠিক দাদা? তোর পথ? - তার চোখে আগুন। আমি মাথা নীচু করে নিয়ে বলেছিলাম - আমি এখন আর কোনো পথের নিশানায় হাঁটছিনা। আসলে, আসলে আমি কোনো পথই দেখছিনা, কিন্তু তোর পথ - সে ও ভুল পথ।

সে আমার ভাই, সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে হাত তুলে আমাকে ডাকতো - চলে আয়, আমার পথই একমাত্র পথ চরমপন্থা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। কিন্তু আমি অনেক দেখেছি, বুঝেছি, ভেবেছি, আমি বুকে হাত দিয়ে বুঝতে পারতাম ভাই আমার শেষ হয়ে যাবে - তাই আমি তাকে -

হ্যাঁ, সেদিন ছাব্বিশে জানুয়ারি, সে বোধহয় পাঁচ? না ছয় বছর আগে?

জনতার ভীড়ে দাঁড়িয়ে আমি ভাইকে চুপিচুপি বলেছিলাম - অমর, দেখ্ কি বিশাল শক্তির বিরুদ্ধে তোরা খেলনা নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিস, তোরা আহাম্মক - আর সেই মুহূর্তে অমর ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, আমার চোয়ালে সজোরে ঘুসি - আমার চোখে অন্ধকার - সে কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

সে আমার ভাই, সে আগুনের স্রোতে সাঁতার দিতে দিতে আমাকে হাত তুলে ডাকতো, তাকে আমি বলেছিলাম আহাম্মক, সে আমাকে জবাব দিয়েছিল শক্ত মুঠোয়, আমার চোয়াল ফেটে রক্ত....তারপর সে হারিয়ে গেল....কোথায়?

আঃ, আমার মাথার পিছনে পেরেকটা ভীষন যন্ত্রণা দিচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে ওখানটা চিরে দিই, বদ রক্ত-টক্ত সব বেরিয়ে যাক, তারপর আমি নবীন হয়ে উঠব, চারিদিকে অসুস্থ গাছেরা সবুজে সবুজ হয়ে উঠবে, হেসে উঠবে খুশির বাতাস, প্রতিটি শিশুর মুখে লাবণ্য....প্রতিটি মানুষের....

আঃ, আমি জানতাম না জীবনে এত পেছানো যায়। আমি একটা এক নম্বরের লোচ্চা....

অথচ আমার বাবা খুব সাচ্চা মানুষ। ছেলেবেলার একটা কথা আমি সারাজীবন ভুলতে পারব না। তখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি। তখন আমরা কলকাতার এই ভাড়া বাড়িতে আসিনি। মফস্বলের এক টাউনে বাবা তখন চাকরি করতেন। আমাদের স্কুলে আমার এক সহপাঠী ছিল - কি যেন নাম তার মনে নেই, শুধু ঘটনাটা মনে আছে। আমার ঘুড়ি লাটাইয়ের সখ ছিল, বহুবার মায়ের কাছে বায়না করে বাবার কাছে বলে পাইনি। আমার বাবা কম মাইনের চাকুরে। এই সামান্য বাজে খরচের সাধ্য তাঁর ছিলনা। তাছাড়া এই সব খেলাধুলা তাঁর পছন্দ ছিলনা।শুধু লেখাপড়া ছেলের ধ্যানজ্ঞান হোক এটাই তিনি চাইতেন। অবশ্য দুই ছেলেকে সেভাবেই তিনি এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

ঘুড়ি লাটাই না কিনে দেওয়ায় আমি একজনের ঘুড়ি লাটাই নিয়ে নিয়েছিলাম – সে আমার প্রাইমারি স্কুলের সহপাঠী, তার তিনটি লাটাই ছিল আর কয়েক ডজন ঘুড়ি। আমি জানিনা তাদের ব্যবসা ছিল না জমিদারি ছিল, না কি তার বাবা অনেক টাকার চাকরি করতেন, কিন্তু তাদের অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল।

সেদিন সন্ধাবেলা ছেলেটি আমাদের বাড়ি এসে বলল, পল্টু, তুই আমার ঘুড়ি লাটাই চুরি করেছিস? তখন বাবা সবে অফিস থেকে ফিরেছেন। কিন্তু চুরি কি জিনিস আমি জানতাম না। আমি ভেবেছিলাম ওর তিনটে আছে আমার একটাও নেই, তাই আমি একটা নিলাম - এইতো। কিন্তু ব্যাপারটা বাবা বুঝলেন না, সেদিন সেই লাটাই আমার পিঠে ভেঙে খানখান হয়ে গেল।

বাবার ওপর আমার কোনো অশ্রদ্ধা নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হবার সাথে সাথে আমি বুঝেছি বাবা যে পদে চাকরি করেন তাতে ঘুষ নিলে বাবা একটা নয় কয়েকটা বাড়ির মালিক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি কিছুই করেননি, তাই আমরা চিরকাল বিভিন্ন জায়গায় ও শেষে কলকাতায় দুখানা ঘরের বাসাতেই জীবন কাটালাম।

যৌবনের প্রথম অধ্যয়ে আমি বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতাম। তখন আমার রক্তে তেজ, চোখে স্বপ্ন। আমি ভাবতাম - মানুষকে পথ দেখানোর জন্য আমি এক অধীশ্বর। আমার দেশের লোকগুলি বড় ভীরু, বড় দুর্বল, বড় সংস্কারে বিশ্বাসী। আমি তাদের আলো দেখাব, তাদের বোঝাব - এই পৃথিবীতে আমরা সকলে সমান অধিকার নিয়ে জন্মেছি। এখানে কারো অঢেল থাকবে আর কারো কিছুই থাকবেনা এভাবে চলতে পারেনা।

আমি এক আহাম্মক। আমাকে অনুসরণ করতে গিয়ে আমার ভাই আরেক কাঠি বেশি আহাম্মক হয়ে হারিয়ে গেছে। আমার বাবাকে এখন আমার আহাম্মক মনে হয়। চিরকাল সাধুতা করে কাটিয়ে - আর আমার মা!

আমার কপাল বিশ্বাসী মা বিশ্বাস করেন তাঁরই দুর্ভাগ্যে সংসারের এই হাল হয়েছে। তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্যই এক ছেলে নিরুদ্দেশ আর এক ছেলে ছন্নছাড়া - চাকরি নেই আয় নেই –

সুতরাং আমার মা রোজ ঈশ্বরের কাছে মাথা খোঁড়েন, সারা দিনে কয়েক ঘন্টা লুকিয়ে চোখের জল ফেলেন, আমার আর আমার ভাইয়ের কুষ্ঠী নিয়ে জ্যোতিষীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান... হাঃ হাঃ! সম্ভবত জননী আমার পরশ পাথর খোঁজেন... বড় জল তেষ্টা পাচ্ছে, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

- অনিমেষ, জলের জায়গাটা দেখি - সে উঁচু গলায় বলল। কিরকম একটা বিশ্রী কর্কশ শোনাল তার কন্ঠস্বর।

মেয়েটি ফিরে তাকিয়েছে, আর সামনের সীটের ছেলেটিও।

অনিমেষ টলমলিয়ে উঠে দাঁড়াল, তার পায়ের কাছে কোথায় যেন জলের ফ্লাক্স ছিল, নীচু হয়ে তুলে নিলো তারপর অনেকখানি ঝুঁকে এগিয়ে ধরল।

এমন ভাবে সে জল খাচ্ছিল যেন দীর্ঘকাল তৃষ্ণার্ত সে মরুভূমিতে ঘুরেছে। গায়ের শাল সরে গিয়েছিল, পাঞ্জাবির খানিকটা ভিজে গেল। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে সে ফ্লাক্সের ঢাকা বন্ধ করতে গেলে পাশের ছোট ছেলেটি বলল - আমি একটু জল খাবো।

খানিকক্ষন রুক্ষ চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, ছেলেটি ভীতু ভীতু চোখে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে জলের পাত্রটা এগিয়ে ধরল। ফ্লাক্সটির মুখে একটা গ্লাস ছিল, ছেলেটি গ্লাসে একটু জল ঢেলে মুখে তুলেছে এমন সময় পিছনের সীট থেকে মেয়েলী গলা - ভাই, আমাকে একটু জল দে - শুনে সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। জানালার ধারে বসা একটি কিশোরী, লাল চাপ চাপ সোয়েটার গায়ে - তার সঙ্গে চোখে চোখ। পাশে বসা সম্ভবত কিশোরীর মা।

ছেলেটি জল খাওয়া শেষ করে বলল - তোকে দোবো কেন? তুই কি

আমাকে জানলার ধারে বসতে দিয়েছিস?
মা - খুকু, তুমিতো অনেকক্ষণ জানলার ধারে বসেছ, দাওনা ছোট ভাইকে একটু বসতে।
ছেলেটি ফ্লাক্সটা নিয়ে চকিতে উঠে দাঁড়াল, বলল - যাবো দিদি?
সে আরেকবার মুখ ফেরালো, দেখল মেয়েটি জল খাচ্ছে, সে মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ছেলেটি পাশ থেকে উঠে গেছে, মেয়েটি তার পাশে এসে বসল। সে এক ঝলক তাকাল, মেয়েটি জলের ফ্লাক্স তার দিকে এগিয়ে দিলো।

বাঃ বাঃ, বেশ বেশ! যাত্রাটা দেখছি বেশ রমনীয় হয়ে উঠল। এই টিন এজারটি দেখছি বেশ ফরোয়ার্ড। দৃষ্টি মোটেই বালসুলভ নয়! বেশ খুকু, এই বয়সে তুমি বেশ চোখের ভাষাটাষা শিখে ফেলেছ! তোমার বয়স অনুযায়ী তোমার বুক অধিক পরিপুষ্ট দেখছি। তার ওপর চাপচাপ লাল সোয়েটার আর বেলবটস্ - তোমাদের মতো ফরোয়ার্ড টিনএজারদের মায়েরা বেশ উদার! তোমাদের পোষাকআষাক তেনারা নিজেরাই বোধহয় পছন্দ টছন্দ করেন এবং তোমাদের ব্যাপারে যথেষ্ট ' ফিল্ ' করেন!

বাঃ! তোমার পুষ্ট জঙ্ঘা দেখছি আমার সঙ্গে বেশ মাখামাখি করতে লেগেছে। আসলে কোনো কোনো টিনএজার এরকম একটু খেলাটেলা করে মজা করতে ভালবাসে। বাহবা বাহবা বেশ বেশ! এই সবই তো জীবন। এই সবই তো কি বলে - 'এনজয় '। দেহ যখন আছে দেহের ইচ্ছাটিচ্ছাও আছে। আমার তো একটু বেশিই আছে! এই চৌত্রিশ বছর বয়সে দেহের ইচ্ছাটিচ্ছা থাকবে না? আমার বাবাতো এই বয়সে দু'ছেলের বাপ হয়ে গেছে - তাই কি? এই বয়সে তেনার দু'ছেলেই প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে গেছে। বেশ বেশ খুকু এসো আপাততঃ আমরা একটু পায়ে পায়ে খেলা করি। ওই দেখোনা আমার বন্ধুরা - কি রকম হামলা হামলি করছে। ওটাকে কি বলব? প্রেম? প্রেম করতে চাইছে?

জানো খুকু আমারও জীবনে প্রেম এসেছিল, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে আমার সহপাঠিনী। তার নাম মধুমিতা। জানো খুকু আমার চেহারায় তখন অনেক ঊজ্জ্বলত ছিল। তাকে পেয়ে আমি আরও ঊজ্জ্বল হয়েছিলাম। জীবনে আমার আদর্শগুলিকে সফল করার জন্য আমি সত্যিকারের সঙ্গিনী পেয়েছি। ওহো - তুমি জানো আদর্শ কি? আরে সে এক ব্যাপার! আমি ছিলাম ছাত্র নেতা। তখন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু নাম বললেই সকলে আমাকে চিনতো, শ্রদ্ধা করত। আসলে এটা একটা নেশা। আমি আমার পার্টির উঁচু স্তরের নেতাদের কী গভীর শ্রদ্ধা করতাম। তাদের প্রত্যেক কথাকে মনে করতাম বাণী। ভাবতাম আমাকেও ওদের মতো হতে হবে। এই অভাগা দেশের এই নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষদের চেতনা আনতে হবে।

এখন কিন্তু আমি এসব নেতাদের পরিস্কার চিনতে পারি। আসলে আমার অবচেতন মনে তখন সেই বয়সে এই নেশাটাই বোধহয় ছিল - আমিও নেতা হবো। আমার কথায় সকলে উঠবে বসবে। আমার কথাই হবে ধ্রুব, আমার সামনে এসে সকলে মাথা নোয়াবে। কিন্তু তখন আমি এটা বুঝতে পারিনি সেই উনিশশো চৌষট্টি সাল - আমার জীবনে অনেক কিছু বুঝে নেওয়ার সময় ছিল। যখন বড় বড় সব নেতাদের বড় বড় কথার মারপ্যাঁচ আর বাকযুদ্ধে পার্টি দুভাগ হয়ে গেল তখন আমি একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছিলাম। তখন আমি মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করে চলেছি চটকল এলাকায়। দিনের পর দিন কেটে যায় বস্তিতে বস্তিতে। কি পঙ্কিল নরকের অন্ধকার জীবন সেখানে। যেন বন্দীপ্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষ অথবা মানুষ নামক অন্য কিছু। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই, নেই ভাল বাসস্থান, অপুষ্টি জর্জরিত মানুষ - সেই সব দিনে আমি যখন আমার দেশের চেহারাটা আরও ঠিক ঠিক চিনে উঠছি ঠিক সেই সব দিনে আমি আরেকটি ভাঙনের মুখে অসহায় দাঁড়ালাম - দেখলাম - আমাদের আদর্শে আমদের রক্ত-শপথ নেওয়া পার্টি দুভাগ হয়ে

যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে সেদিন সব কিছু ওলট পালট, আমি বিচার করে বুঝতে চাইছিলাম। ওরা এখন ওরা হলো - ওরা তো আমরা ছিলাম, আমরা সকলে চেয়েছি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে - তাহলে?

সেদিন আমার শিক্ষালাভ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করিনি। আমার মতো ছোট ছোট নেতারা তখন ভাসমান কচুরিপানার মতো, কেউ এভাগে, কেউ ওভাগে আটকে যাচ্ছিল। আমিও আমার ঘনিষ্ঠ এক নেতার ভাগে রয়ে গেলাম। কিন্তু আমি ভুল করেছি, সেদিন ঠিক ঠিক শিক্ষা নিতে পারলে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আজকে আমি সুখী মানুষ হতে পারতাম। সেদিন ঠিক ঠিক শিক্ষা নিতে পারলে মধুমিতা হারিয়ে যেতোনা। সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল - সব কিছুতে একটা ভুয়ো আবরণ দিয়ে ভেতরে চলছে ক্ষমতা আর ব্যক্তিগত স্বার্থের লড়াই। সে বলেছিল - এগুলি আমার কথা নয়, এগুলি আমার বাবার কথা। তাঁর বয়স হয়েছে, তিনি পরিস্কার চোখে অনেক কিছু দেখতে জানেন। তুমি জানো, বাবা পার্টির জন্য জীবনের সব সুখ ঐশর্য্য র্বিসর্জন দিয়েছেন। আজকে তিনি গভীর বেদনায় চুপচাপ বসে গিয়েছেন।

আমি ওর বাবাকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম। সেই পথ দিয়েই ও আমার জীবনে এসেছিল, কিন্তু সে চলে গেল। না কি আমি তাকে সরিয়ে দিলাম? সে বলেছিল - দেখ, আমি মেয়ে, আমি ভালবাসা চাই, ঘর-সংসার চাই, অবশ্য আমি আদর্শবান স্বামীর মধ্যে দিয়েই এসব চাই। আর তাইতো আমি তোমাকে ভালবাসি।

....সে এইসব চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাকে দিতে পারিনি। সেদিন আমি তার শ্রদ্ধেয় বাবাকে স্বার্থপর নীচ বলেছিলাম, আমি বলেছিলাম -

আঃ, খুকু, তুমি তোমার স্পর্শ সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। তুমি কত ছোট, তুমি যদি তোমার বয়সের মতো স্বাভাবিক হতে, যদি আমার গায়ের

ওপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে জানালার ধারে, বলতে - দেখুন দেখুন ওই পদ্মপুকুরটা কি সুন্দর! যদি তেমার চোখ দুটিতে মায়াময় সরলতা ছলছল করতো! আঃ, খুকু, তুমি তোমার পা সরিয়ে নাও, আমার লাগছে...

আমি জানি, এসব তোমার দোষ নয়, তোমার মতো নিষ্পাপ শিশুদের নষ্ট করে কিছু বয়স্ক মানুষ, পরিবারের ভেতরের মানুষ যারা স্নেহের আবরণে সর্বনাশ করে, তারা কীট। আমি অনেক দেখেছি, অনেক বুঝেছি।

বাসটা থেমে গেল, কন্ডাকটর বলল - আপনারা নামতে পারেন, এখানে আমরা দশ মিনিট দাঁড়াবো।

সবাই নামতে ব্যস্ত। মেয়েটিও দাঁড়াল।

- ফিরে এসে তুমি তোমার সীটে বসবে - গম্ভীর ভাবে মেয়েটিকে বলল সে, পিছন ফিরে ওর ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল - খোকা, তুমি এখানে এসে বসবে, এই জানলার ধারে, ঠিক আছে?

কি আশ্চর্য, মধুমিতা, আমি তোমাদের দেশে এলাম। তুমি যখন দুচার দিনের ছুটিতে কলকাতার মামার বাড়ি থেকে মেদিনীপুরে নিজেদের বাড়িতে আসতে তখন তুমি কথায় কথায় বলতে - দেশে যাবো। এনিয়ে আমি তোমাকে ক্ষ্যাপাতাম - দেশে যাবে? আচ্ছা, মেদিনীপুর দেশের রাজা কে? না কি ওটা গনতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট, না ক্যাপিটালিষ্ট? আচ্ছা, ওটা পৃথিবীর কোন অংশে অবস্থিত? ওই দেশের উত্তরে কি ভারতবর্ষ? তুমি হাঁউমাঁউ করতে।

মধুমিতা, তুমি কি তোমার ঘর সংসার পেয়ে গিয়েছ? সুখী সংসার? আদর্শ স্বামী? যে পরিপাটি চাকরি করে, স্ত্রী ও সন্তানের জন্য একান্ত মনে শরীর মন উৎসর্গ করিয়া জীবন যাপন করিয়া থাকে? ভাল! ভাল! আমিই শুধু একটা আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মক নিজের জন্য কিছুই গুছিয়ে নিতে পারলুম না।

তোমাদের দেশে আমি আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মক শেষবার

এসেছিলাম সাতষট্টি সালের গ্রীষ্মকালে বোধহয়। সে এক মহতী সভায় বড় বড় নেতাদের সাথে আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেদিন আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মকের কী উদ্দীপনা! তখন আমরা চোদ্দ দলের বাচ্চছারা এক হয়েছি, রাজ্যে আমাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে, আমাদের বড় বড় দাদারা মন্ত্রী হয়েছেন, আর আমরা আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মকেরা আবীর মেখে নেচে-কুঁদে ভেবেছি - কী বিশাল বিপ্লব হয়ে গেল! এবার আমরা রাজ্যকে একেবারে কী? কী যে শালার করে ফেলব সে ঠিক ভাষায় বা ভাবেও বোঝাতে পারছিলাম না। সে রকম একটা সময় বিজয় উৎসব এবং জনসংযোগের মহৎ কাজের জন্য এখানে এসেছিলাম। এখানে এক মহতী জনসভা হয়েছিল। সেদিন আমার মনে হয়েছিল একবার তোমাদের বাড়ি চলে যাই, তোমার বাবাকে উঁচু গলায় বুক ফুলিয়ে বলে আসি - দেখুন, আমরা কী করেছি!

আসলে সেদিন আমার মনে এরকম একটা অহঙ্কার বেশ লাফালাফি করছিল, এখন সেটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি এভাবে - যে আমি কি হনু রে! এখন আমি বুঝতে পারি তখন আমার ল্যাজ গজিয়েছিল, আর তাই এত লাফালাফি করছিলাম, তাই আমি তোমার বাবাকে অপমান করতে যাবার কথা ভাবতে পেরেছিলাম। শেয পর্যন্ত যাওয়া অবশ্য হয়ে ওঠেনি, কি জানি বারবার কেন যে তোমার কথা মনে পড়েছিল! তুমি বাড়িতে আছ কি নেই? যদি থাকো কি ভাবে তোমার মুখোমুখি হবো? আর শুধু এই কারণেই যাওয়া হয়নি। ভাগ্যি যাইনি! কি বলে সেই উঁচু মানুষকে অসম্মান করে আসতাম কে জানে! এখন আজ এই বাস থেকে তোমাদের গ্রামে নেমে পড়ব নাকি, মধুমিতা? এই ল্যাজ-খসা আহাম্মক হনুমানটার মুখ একবার দেখাবো নাকি তোমাকে, বাবাকে?

আঃ! কে জানে তোমার বাবা বেঁচে আছেন কি না? তুমি এখন কোথায় আছ কোন্ সুখী মানুষের সুখের সংসারে - আঃ! আমি শালা একটা

আহাম্মকের বাচ্ছা আহাম্মক লোচ্চা নম্বর ওয়ান হ'য়ে গেলাম, এতদিনে আমি সমঝদার মানুষ হয়েছি। আমার ল্যাজ ছোট হতে হতে খসে গিয়েছে। আমি দেখেছি ব্যক্তি-স্বার্থ আর আকাঙ্খা দেশ গঠনের বুকনির আড়ালে কত বিশাল। আমি দেখেছি রক্তে পিচ্ছিল পথ, কি জঘন্য, কি নারকীয়, কি বিভৎস। আমি হতবাক হয়ে দেখেছি আমার আদর্শ আমার একাগ্রতা আমার ত্যাগ - যা নিয়ে আমি চলেছি সে সব বিসর্জন দিয়ে আমাকে অন্য কাজ করতে হয়েছে। আমার চারপাশে পার্টি ক্যাডার বলে যে সব সঙ্গী তাদের আমি কখনো দেখিনি, তাদের আমি চিনি না, তারা ঘৃণ্য, অথচ নেতাদের নির্দেশে তাদের সঙ্গেই আমাকে কাজ করতে হয়েছে। সে কাজ সংগঠনের নয়, জনচেতনার নয়, সে কাজ ধ্বংসের, প্রাণহননের.... আর সেভাবেই আমি ক্রমশঃ মানুষ হয়ে গেলাম।

এই পথ! এই দেশগঠন! এই তো বিপ্লব! ঠিক সেইসব দিনে তোমাকে আমার বড় বেশি করে মনে পড়েছে মধুমিতা, মনে হয়েছে আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। মনে হয়েছে আমি ভুল পথে এসেছি। মনে হয়েছে আমি যদি তোমাকে ফিরিয়ে না দিতাম! যদি সুখের ঘর গড়বার জন্য চেষ্টা করতাম.... এখন আমি তোমার দেশের মাটি মাড়িয়ে যাচ্ছি মধুমিতা। আমি - একটা আহাম্মক, লোচ্চা নাম্বার ওয়ান। এখন যদি তুমি আমার পোড়া মুখটা একবার দেখো ঘৃণায় শিউরে উঠবে। আমাকে ঘৃণা করে আমার বাবা। মা আমাকে ঘৃণা না করলেও কথা প্রায় বলেনই না, আর আমার ভাই – সে আমাকে একদা দেবতার মতো ভাবত, আমার ভাই - সে আমাকে একদা অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে তারপর আমার পরিবর্তনে তিল তিল করে ঘৃণা জমেছে তার বুকে। শেষাবধি আমাকে আর সে সহ্য করতে পারেনি। ....ভাই, তুমি কি ঠিক পথের নিশানা পেয়েছিলে? কি জানি তোমরাওতো ছিন্নভিন্ন হয়ে গুঁড়িয়ে গেলে। আমি জানি - মায়ের ঈশ্বর হাজার মাথা খোঁড়াতেও তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমিতো তোমাকে সেই

শক্তি দেখাতে এক ছাব্বিশে জানুয়ারি প্যারেড গ্রাউন্ডে নিয়ে গিয়েছিলাম। তাদের এক একটা ছোট্ট বুলেট খেলার ছলে তোমাদের ডুবিয়ে দেবে অন্ধকারে। আমি জানি - মায়ের ঈশ্বর হাজার মাথা খোঁড়াতেও তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। অথচ মা বিশ্বাস করে তোমার কুষ্ঠিতে লেখা দীর্ঘ আয়ু! কি জানি, মায়ের ইচ্ছাই সত্যি হোক। আমিও আজকাল এসব কিছু বিশ্বাস করি। আমি প্রত্যেক শনিবার চৌমাথার মোড়ে জমজমাট শনিপুজোর থানে ধূপ জ্বালিয়ে দিয়ে জোড়হাতে প্রার্থনা করি.... গত শনিবার প্রার্থনা করেছি - হে ঠাকুর, প্রধানমন্ত্রী সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষনা করেছেন, এবারে বেশ মোটা টাকার একটা দাঁও মারিয়ে দিও ঠাকুর। আমার ভাবনা কি! আমি এখন শাসক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি, এখন তুমি যদি একটু মুখ তুলে চাও ঠাকুর আমি একটু গুছিয়ে নিই। আঃ, ভাই, তুমি কি আমার মনের কথা শুনতে পাচ্ছ? তুমি আমাকে বড্ড জ্বালাতন করো। প্রায়শই তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঝাঁকিয়ে জ্বলজ্বলে চোখে তাকাও - আর ঠিক তখন আমার মাথার পিছনে পেরেক বেঁধা যন্ত্রণা...মনে হয় একটা ছুরি দিয়ে – কিন্তু তুমি কেন আমার দিকে ওরকম চোখে তাকাবে? এছাড়া আমার আর কি করার ছিল? প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে আমাকে অনেক রক্ত নেওয়ার ইতিহাস রচনায় মদৎ দিতে হয়েছে।ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরে। শুধু ওপরের নির্দেশে। আর ছিল ভয় – নিজে হারিয়ে যাবার ভয়। আর তারপর? সব কিছু যখন থিতিয়ে এলো? তখন আমাকে গ্রাস করে নিলো শাসক ময়াল - সব অপরাধ মুছে দেওয়ার চুক্তিপত্র হাতে দুলিয়ে সে আমাকে মদৎ দিতে ডাকল....এছাড়া আর কি আমি করতে পারতাম? সেই সব ছিন্নভিন্ন নষ্ট দিনগুলিতে - যখন সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে, সেই হানাহানির দিনে যখন ঐক্যের শপথ নেওয়া চোদ্দ দল বিপর্যস্ত আর সেই সুযোগে শাসক ময়াল নিশ্চিন্তে গ্রাস করছে সবকিছু - তখন আমি অসহায়, তখন আমি বাঁচতে চেয়েছি, আশ্রয় চেয়েছি, দিশাহারা অবস্থা থেকে যে কোনো

মূল্যের বিনিময়ে মুক্তি পেতে চেয়েছি....

.... ভাই, তুমি তোমার চোখ সরিয়ে নাও, আমার লাগছে। আমাকে সব যন্ত্রণা ভুলে একটু শান্তি পেতে দাও, একটু আনন্দ পেতে দাও....

আহ্! হাওয়ায় কেমন এক নতুন স্পর্শ! এমন বাতাস তো আমি আগে কখনও ছুঁইনি! তবে এই কি সমুদ্রের বাতাস? সমুদ্র কি কাছে এলো?....ভারী সুন্দর হাওয়া লাগছে! এই আমার সমুদ্র! এই বিশাল....এই দুরন্ত....আহ্, জীবনে কেন আমি এতদিন সমুদ্র দেখিনি? আমি কি এখনই ছুটে যাবো? ছুঁয়ে দেখব দুরন্ত ঢেউ....

সে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, সোনালী বালি মাড়িয়ে সম্মোহিতের মতো।

অনিমেষ ডাকল - এই, এখনই ওদিকে গেলে চলবে? আমাদের থাকবার জায়গাটা খুঁজে বের করতে হবে না?

পরিমল – এই অনিমেষ, আমাদের রেষ্ট হাউস কোন দিকে?

অনিমেষ - আমি কি করে জানবো? আমি কি আগে এখানে এসে দেখে গেছি? পরিমল - বাঃ! তুই তো বলেছিলি রেষ্ট হাউস বুক করে রেখেছিস।

অনিমেষ পকেট থেকে একটা লালচে রঙের কাগজ বার করল, বলল –

করেছি তো, এইতো রিসিট্, কিন্তু বাড়িটা খুঁজে বার করতে হবেতো।

- কেন তোরা ঝগড়া করছিস? ওইতো ওই বাড়িটার গায়ে লেখা - রিসেপসন্, ওখানে সবাই যাচ্ছে দেখছিস না? নিশ্চয় ওখানে গেলে জানা যাবে। দেখি আমাকে কাগজটা দে - সে অনিমেষের কাছ থেকে কাগজটা নিলো।

অনিমেয - ব্যস ব্যস, গুরু একটিভ হলেই আমি নিশ্চিন্ত! মাঝে মাঝে এমন গম্ভীর না কি উদাস হয়ে যাস মাইরি, একদম কথা বলিস না, তখন তোকে দেখলে আমি খুব মুষড়ে পড়ি। কেমন ভয়ও লাগে। সে হাসে। অনাবিল

হাসি। এগিয়ে গেল।

রিসেপশান বিল্ডিংএ ঢুকে ইতঃস্তত নানা মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে - কলরব - সে একে ওকে পাশ কাটিয়ে কাউন্টারে পৌঁছে যায়, কাউন্টারে জিজ্ঞাসারত সেই দেমাকী মেয়েটি। মেয়েটি ফিরে দাঁড়ায় আর তার সামনাসামনি। মুহূর্তে মেয়েটির স্বাভাবিক মুখমন্ডলে অস্বাভাবিক রেখা ফোটে, ভুরুর ওপর ভাঁজ এবং ঠোঁটের পাশে কোথায় যেন বাঁকা ভাব। মেয়েটি সোজাসুজি তার দিকে তাকাল, হঠাৎ বলল - আপনি অমরের দাদা না? সে হকচকিয়ে গেল আর ততক্ষণে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। মেয়েটি এগিয়ে যাচ্ছে, সে ডাকল - শুনুন - কিন্তু মেয়েটি দাঁড়াল না বা ফিরে তাকাল না, তার হেঁটে যাওয়ার ভঙ্গিতে কেমন এক ঋজুতা। সে আরও উঁচু গলায় প্রায় কর্কশ কণ্ঠে ডাকল - শুনুন - কিন্তু মেয়েটি তখন দরজা পেরিয়ে বাইরে চলে গেছে।

সে কাউন্টারে জিজ্ঞাসা করে - আচ্ছা, এটা দেখুন তো, আমাদের রেষ্ট হাউস বুক করা আছে এটা কি করতে হবে?

কাউন্টারের ভদ্রলোক কাগজটা প্রায় দেখেনওনা, বলেন - সামনে ওই যে হোটেল সৈকতাবাস ওর সামনে চলে যান, কেয়ারটেকার আছে, দেখা করুন।

সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে আসে, এদিক ওদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে, কিন্তু মেয়েটিকে বা তার বাবা মা ভাই কাউকেই দেখতে পায় না।দূরে বন্ধুরা এলোমেলো খেলার ছলে পায়ে পায়ে বালি ছড়াতে ছড়াতে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। সে দ্রুত ছুটে আসে,বলে - এই, তোরা কেউ মেয়েটিকে দেখেছিস? তিনজন অবাক চোখে তাকায়।- কে? কোন মেয়েটা? - সেই যে, বাসে আমদের সঙ্গে এলো - সুন্দর মতো –তিনজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করে - কই, না তো।

বাড়িটা সুন্দর। পূবের জানালা খুললে হাওয়া ছুটে আসে বালি ছিটিয়ে –

চঞ্চল শিশুর মতো। সোনালী বালির ওপর স্রোতের মতো দাগ পড়ছে। একটু দূরে ঝাউবন, ঝাউপাতার ঝিলিমিলির ফাঁকে সমুদ্র নীল। দুরন্ত ঢেউ ভাঙছে, ফুঁসিয়ে উঠছে সাদা ফেনা।

কেয়ারটেকার ঘর গুছিয়ে জিনিসপত্র বুঝিয়ে চলে গেছে। পাশাপাশি দুটি ঘর, চারটে বিছানায় টানটান সাদা ধবধবে চাদর বালিশ। বাক্স ব্যাগ খোলাখুলি - এটা সেটা বেরোচ্ছিল - জামাকাপড়, সাবান, তোয়ালে, টুথপেষ্ট। এটা কোথায় রাখি, ওটা কোথায় রাখি - বাথরুমটা কি সুন্দর আর পরিস্কার! আহ্ খাওয়ার ঘরটা দারুণ!

ওপাশে রান্নাঘর থেকে ডেকচির পেছনে চামচ দিয়ে বাজাতে বাজাতে কুন্তল গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে আসে - ঝুমঝুমকে নাচোরে গাও বাজাও - তারপর একপাক নেচে নিয়ে বলে - আাহ্! রান্নাঘরে সব আছে, আর ডিনার সেট্ - শালা, প্লেটটেট্ গুলো যা দামী না! আজ রাত্তিরে জবরদস্ত মুরগী রাঁধবো, আার ভাত, আর সরু সরু আলুভাজা - আর - আর -

পরিমল - শালা রাত্তিরের মেনু বানাচ্ছে। এখন পেটে ছুঁচোয় ডন দিচ্ছে! এখন কি খাওয়া হবে?

কুন্তল - সে তো ঠিক হয়ে গেছে, আমি কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করেছি। চানটান করে নাও তারপর বেরিয়ে পড়ো, ওই রিসেপশনের ওদিকে খাওয়ার হোটেল আছে অনেক। কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে, বেলা হয়ে গেছে, বেশী দেরী করলে কিছু পাওয়া যাবে না। কি গুরু, তুমি আবার গুম মেরে যাচ্ছো। বেশ তো চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলে -

সে দাঁড়িয়েছিল পূবের জানালায় - বাইরে চোখ - কুন্তল তার খুব কাছে এগিয়ে আসে, বলে - এরকম ভাবে তুই একদিন পাগল হয়ে যাবি।সে কুন্তলকে এক ঝটকা মারে, জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় বিছানায়, বলে - হেই, চলো সব, সমুদ্রে চান করা হবে।

এখন সমুদ্রের ধারে কেউ নেই, কেউ স্নানও করছে না। স্নিগ্ধ

রোদ্দুর, ঈষৎ শীত শীত হাওয়া। জল ছুটে আসছে আর ছুটে যাচ্ছে। তারা ভীতু ভীতু পায়ে একটু এগোয় একটু পেছোয়। জল আর বালি মাখল তারা। শিশুর মতো খেলা। এভাবে এ- ওকে ও-তাকে ফেরার জন্য তাগাদা - তারপর ঘরে এসে আবার পরিস্কার স্নান করে দল বেঁধে খেতে যাওয়া।

- মাছ একটা, ডাল ভাত তরকারি যত ইচ্ছা নেবেন - আড়াই টাকা।

- ঠিক আছে, আলাদা আরো একটা করে মাছ দাও, আর কি আছে? ডিম? ঠিক আছে একটা করে ডিমও দিও।

- ভাত যত খুশি খাবো? শেষে রাগ করবে না তো?

- না না দাদা, খাননা কত খাবেন, আপনারা কোলকাতার বাবুরা আমাদের চেয়ে বেশি খেতে পারবেন না।

- কেমন চালের ভাত?

- দেখতে হবে না, হেঁ হেঁ, এ আপনাদের রেশনের মোটা কাঁকরমণি নয়, ভাত খাওয়াবো জুঁই ফুলের মতো....

শান্ত দুপুর। চারজন দস্যি শান্ত ঘুমোচ্ছিল। জানলার ওপারে একইভাবে বালির ওপর দাগ কাটছে একটানা বাতাস। ঝাউবনের ঝিলমিল একইভাবে কাঁপাকাঁপি করছে। তার ওপারে সমুদ্র, সারাক্ষণ ঢেউ বাজিয়ে চলে, চরাচরে সব কিছু ছাপিয়ে জেগে রয়েছে তার গর্জন....

বিকাল এগিয়ে আসে। পরিমল আগে উঠেছে, ডাকাডাকি করতে করতে যখন কেউ উঠছিল না তখন সে সকলকে ধাক্কাধাক্কি করতে শুরু করল কিন্তু তথাপি কাউকে ওঠাতে পারল না তখন ধুৎ বলে বাথরুমে চলে গেল। তখন অনিমেষ উঠে বসল।

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কেয়ারটেকার।

- তুমি কোথায় থাকো? - অনিমেষ জিজ্ঞেস করল।

- কাছেই থাকি বাবু, আপনাদের কোনো দরকার আছে কিনা জানতে এলুম,

এবেলাও কি হোটেলে খাবেন?

- ধুর! হোটেলে খেয়ে কি পোষায়? আচ্ছা, এখানে মুরগী পাওয়া যায়?

- যেতে পারে। বিকেলে বাজার বসে, ওখানে কেউ কেউ নিয়ে এসে বসে থাকে।

- তার মানে পাওয়া না ও যেতে পারে।

- না ও যেতে পারে - কেয়ারটেকার বলে।

- আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো, তুমি আমাদের মশলাপাতি তেল-টেল এসব এনে দাও, এখন আমরা বেড়াতে বেরোবো, ঘন্টাখানেক বাদে ফিরবার সময় বাজার করে আনবো। দেখি কি পাওয়া যায়। তোমার নামটা কি যেন?

- পরেশ।

তারা হাঁটছিল। একপাশে সমুদ্র আরেক পাশে ঝাউবন। সূর্য ডুবছে। এখন নীল জলরাশি লালে লাল। সূর্যকে সামনে রেখে তারা হাঁটছিল।

- যতদূর চোখ যায় ঝাউবনের শেষ নেই - বলে কুন্তল - ওই ও-ই অনেক দূরে একটা যেন বাঁক মনে হচ্ছে, আমরা ওই পর্যন্ত যাবো।

- ও তো অনেক দূর। আমরা কতদূর চলে এসেছি দেখেছিস? পেছন ফিরে দেখ। চারজন ফিরে দাঁড়ায়। কাছাকাছি কোনো লোকজন নেই। বহুদূরে - যেখান থেকে তারা হাঁটতে শুরু করেছিল সেখানে ছোট্ট ছোট্ট কিছু মানুষজন দেখা যাচ্ছে।

- আরে বাস্! কতদূর চলে এসেছি! এখান থেকে ফিরতেই তো ঘন্টা কাবার হয়ে যাবে!

সহসা কুন্তল ছুটতে আরম্ভ করে। দেখাদেখি সকলে ছুটতে আরম্ভ করে। ছুটতে ছুটতে কখনো এ ওকে কখনো ও একে পেরিয়ে যায়। হাসে, ধাক্কা দিতে চায়। বালির ওপর পায়ের ছাপ ছাপিয়ে তারা ছোটে। ঝাউবন বুঝি ঝমঝম শব্দ করে। সমুদ্র খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে আসে ছুটে যায়,সূর্য হাত তুলে বলে যা-ই - এই - যা-ই তারপর টুপ করে ডুবে যায়।

তারপর আবার তারা মুখোমুখি। বাজারে চাল কিনতে কিনতে হঠাৎ অনিমেষ বলল - এই, সেই মেয়েটা - খুব নীচু গলায় প্রায় তার কানের কাছে মুখ এনে - সে তাকিয়েছে।

বাজারটা একটা সিমেন্ট বাঁধানো খোলা চত্বরে। সারি সারি বসেছে বিক্রেতারা। তারা যেখানটায় চাল কিনছে তার পরের সারির শেষে মেয়েটি যেন কি কিনছে, পাশে দাঁড়িয়ে তার ভাই। ভাইটি নীচু হয়ে মেয়েটিকে কি যেন বলল, মেয়েটি এদিকে তাকালো, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পুণরায় কেনাকাটায় মন দিলো।

সে দুজন বিক্রেতার মাঝে সরু জায়গা দিয়ে ওপাশের সারিতে চলে যায়, দ্রুত এগিয়ে গেল। ভাইটি তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, দৃষ্টিতে ঈষৎ ভীতি, সে দিদিকে ঠেলা দিলো। মেয়েটি দাম দিয়ে খুচরো ফেরৎ নিচ্ছিল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভাইকে বলল - চল্। - এবং তাকে দেখতে পেল।

- আপনি অমরকে চেনেন? - সে জিজ্ঞাসা করল।

- কেন? - মেয়েটির কণ্ঠস্বরে কেমন এক রুক্ষতা।

- সে একটু বিচলিত, বলল - আমি তাকে খুঁজছি।

মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে চলতে শুরু করল।

- শুনুন - সে ডাকল, ওদের পিছন পিছন এগিয়ে চলল - বলুন, যদি ওর সম্বন্ধে কিছু জানেন বলুন, আমি তাকে খুঁজছি।

মেয়েটি ফিরে তাকায়ও না, শুধু বলে - আমি তার সন্ধান জানিনা।

তিন বন্ধু তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, অনিমেষ বলল - কি ব্যাপার রে?

- কিছুনা, - মাথা নাড়ল সে, মুখ নীচু করে এগিয়ে চলল।

রেষ্ট হাউসে এসে সে অন্ধকার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। ওপাশে রান্নাঘরে ওরা কলরব করছে -

- তুমিতো খুব কাজের লোক পরেশ, উনুনে আঁচ দিয়ে রেখেছ। ঠিক আছে,

ভাতটা চাপিয়ে দাও, আমরা ততক্ষণে এদিকে দেখছি।

- কুন্তল, মুরগিটা কেটে ফেল।

- আরেকটু চা হলে হতো। - দোকানে কি যে চা খেলাম -

- চায়ের জিনিসপত্র কে কিনেছে?

- আর চা খেয়ে কি হবে, ব্ল্যাক নাইটের বোতলটা খুলতে হবেতো -

- ভাত হতে হতে এদিকটা গুছিয়ে ফেল, মাংসটা চাপিয়ে দিলেই ব্যাস, আর কিছু রাঁধবার দরকার নেই, আধ ঘন্টায় সব হয়ে যাবে।

- পল্টু শালা যে কি! দিন দিন কথাবার্তা ভুলে যাচ্ছে, আর কিছুদিন পরে বোধহয় হাতটাত নেড়ে ইশারা করে চালিয়ে দেবে।

- না রে, ও সবসময় মনে মনে বকবক করে।

- ব্যাটাকে আজ হুইস্কি দিয়ে বোঝাই করে দোবো, মাল পেটে পড়লে ওর মুখ খুলে যায়।

- মেয়েটার সঙ্গে কি ব্যাপার বলত? কিছু করতে চাইছে না কি?

- দূর দূর, ওসব ও চায় না।

- তবে কি চায় বলতো?

- ও যে কি চায় ও নিজেই জানেনা।

- তাতো আমরা শালা কেউই জানিনা।

- তুই জানিস, তুই কি চাস?

- আচ্ছা, আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন ও একজনের সঙ্গে প্রেম করত, সেটা কি হলো বলত?

- মেয়েরা ওসব পার্টি-ফার্টি বোঝে না, সে চেয়েছিল ও চাকরি বাকরি করুক, সংসার টংসার করুক -

- মেয়েরা ওসব পার্টি-ফার্টি বোঝে না! আমরাও বুঝি না-কি শালা! এখন কিছু জোটেনা তাই টুপাইস ধান্দায় এখানে জুটে গেছি।- ও কিন্তু লাল পার্টির

জন্যে ভীষণ খেটেছে, অথচ কেন যে ছেড়ে দিলো! পরেশ, ভাত চাপানো হয়ে গেছে? আচ্ছা, এই নাও টাকা, তুমি চারটে সোডার বোতল নিয়ে এসো, পাওয়া যায়তো?
- এই কুন্তল, মাংস ছোট ছোট টুকরো করিস না।

মা সরস্বতীর কৃপায় হুইস্কিটা ভালই হয়েছে। অনেক দিন পর মাইরি জমিয়ে মাল খাওয়া হচ্ছে। ও কি গুরু, তুমি কখন থেকে গ্লাসটা খালি করতে পারছ না? - বলতে বলতে কুন্তল অর্ধেক গ্লাসটা ভর্তি করে দেয়।

অনিমেষ খিক্ খিক্ করে হাসে, বলে, চাঁদা তোলার সময় পল্টু যা করেছে না! ওর মাইরি একটু মায়াদয়া নেই, বেশি বকবে না, খালি কিরকম একটা খ্যারখেরে গলা করে বলবে - যা লিখেছি দিয়ে দিন, ওর কমে চাঁদা নিয়ে পুজো হয় না - খিক্ খিক্ খিক্।

পরিমল - আতরদের বাড়ি, মাইরি, আতরের মায়ের অসুখ, আতরের বাবা তো রাইটার্স বিল্ডিংয়ে থার্ড ডিভিসন, মাইনে যা পায় মাসের অর্ধেকে ফুরিয়ে যায়, তার ওপরে ওরকম একটা রুগী, তার উপর আবার মাসের শেষ, কিন্তু পল্টু কি করে অমন ধমকালো -
- কি নিষ্ঠুর হয়ে গেছিস তুই, একটুও মায়াদয়া নেই - পরিমল যেন কাঁদে।
- অত মায়াদয়া করলে এমন মেজাজে হুইস্কি হতো? না মুরগী চাটতিস্? অত আতর আতর করছিস কেন? আতর বুঝি তোর পেয়ারের ইয়ে হয়? দে তোকে মাল খেতে হবে না। - বলতে বলতে সে হাত বাড়ায়।
- যাক্ যাক্ যেতে দাও - কুন্তল হাত নেড়ে বলে - আরে এবার বড় দাঁও আসছে, ভোট, ছুঁচো মারা কাজ চাঁদা তুলতে হবেনা, থোক কড়কড়ে গোছা আসবে, না কি গুরু? কিরকম আসবে এবার?
- খুব একটা বুঝতে পারছি না রে - বলে সে - ভোট হঠাৎ কেন হচ্ছে বুঝতে পারছি না! অনেক দিন বিরোধী পার্টিরা নড়তে চড়তে পারেনি, সব

বন্ধ, কাগজে বেচাল কিছু লেখা বন্ধ, দেওয়ালে পোষ্টার পর্যন্ত বন্ধ, জেলে অনেক নেতা বন্দী হয়ে আছে, এখন ওরা একটুও তৈরি নেই, হঠাৎ ভোট করে নিলে ওরা কোনো সুযোগই পাবে না।

- তা ছাড়া আমাদের হাত সাফাই তো আছেই - অনিমেষ বলে। সে কটকটে চোখে অনিমেষের দিকে তাকায়, বলে - হ্যাঁ, আমাদের হাত সাফাই! আমি জানি আমাদের হাত সাফাই না করলে এখনও এই দেশে কোটি কোটি জনসাধারণ ছড়িয়ে রয়েছে যারা ঠিকঠাক ভোট দিয়ে আসবে, তাদের মিটিং করে পোষ্টার মেরে কানে কাঠি দিয়ে বোঝাতে হবেনা। আমি জানি আমার দেশে ছড়িয়ে আছে লক্ষ লক্ষ যুবক যাদের ভোটে খাটবার জন্য টাকা দিয়ে ডাকতে হবে না। যাদের বুকের ভেতর ছড়িয়ে আছে আগুন। যারা আদর্শের জন্য নিঃশব্দে বহন করছে জীবন যন্ত্রণা। কলে কারখানায়, হাটে বাজারে মাঠে ময়দানে লক্ষ লক্ষ সেইসব বন্ধুরা, যাদের আমি দেখেছি, যাদের সঙ্গে আমি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেটেছি তাদের আমি চিনি - সে হঠাৎ চুপ করে যায়, ঘরের মধ্যে তার ভারী কণ্ঠস্বরের রেশ যেন গমগম করে।

অনিমেষ হঠাৎ খিক্ খিক্ করে হেসে ওঠে, বলে - গুরু মাইরি মাঝে মাঝে ভুলে যায় যে লাল পার্টি সে কবে ছেড়ে দিয়েছে। সেই একটা গেরস্ত বউ অভাবে খানকি-খাতায় নাম লেখালো, তা সে ঘরের কথা আর ভুলতে পারে না, কথায় কথায় খালি আমার ভাতার আর আমার ভাতার! গুরুর আমার সেই অবস্থা!

- এই শালা, চোপ - সে লাফিয়ে ওঠে, কুন্তল তাকে জাপটে ধরে, বলে - যাঃ শালা, নেশাটা মাটি হয়ে যাচ্ছে। তুমি মাইরি ঠান্ডা হও গুরু, ওর কথায় কান দিওনা - কুন্তল ওকে চেয়ারে বসিয়ে দেয়, গেলাসটা হাতে ধরিয়ে দেয়, বলে - নাও, এটুকু শেষ করে ফেলো।

সে এক চুমুকে বেলাসটা খালি করে দেয়, ঠক্ করে ওটা টেবিলে রাখে, বলে - এক ঘুষিতে ওর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দোবো।

অনিমেষ মাথা নাড়ে, - তা দাও, কিন্তু তুমি অতো সাধু সাধু জনসাধারণের কথা বোলোনা, ওসব আমার চেনা আছে। ওরা শালা লাল পার্টির সময় গলায় রুমাল বেঁধে চাকরির ধান্দা করেছে, আবার গনেশ উল্টে গেলে রুমাল পকেটে পুরে যুগ যুগ জিও করে মিনি বাসের পারমিটের ধান্দা করে! ও শালার জনসাধারণের কথা ভুলে যাও, ভোটের দিন কিরকম কি করলে ভীতুর বাচ্ছারা ভোট দিতে যাবেনা সেই চিন্তা করো।

- চুপ কর, চুপ কর - বিড়বিড় করে বলে, চেয়ারের পিছনে মাথা এলিয়ে দেয় - আমার মতো দু-চারজন নষ্ট কুত্তা হয়ে গেছে, তাদের দিয়ে সকলের তুলনা করিস না। আমি জানি, হ্যাঁ আমি জানি - বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়ায় - আমি দেখেছি আমার দেশের মানুষদের, তাদের মধ্যে কি আগুন আছে আমি জানি, শুধু দরকার সঙ্ঘবদ্ধ করার মতো নেতৃত্ব, কিন্তু সেটুকুই নেই। আমি একজনও মানুষ দেখিনা যে শক্তিধর।

উত্তেজনায় তার চোখমুখ লালচে, সে সোয়েটার খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

পরিমল বলে - আমি কিন্তু একসময় ভাবতাম তুই একদিন খুব বড় হবি, নেতৃত্ব দিবি, সেই যখন আমরা কলেজে পড়তাম, তুই কলেজের গেটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতিস –

-না, না, আমি খুব সামান্য মানুষ, আমার কোনো শক্তিটক্তি নেই। এখন আমি এটা বুঝতে পারি। অনেক আগে এটা আমার বোঝা উচিত ছিল। তাহলে জীবনটাকে অন্য ছাঁচে ঢেলে নেওয়া যেত। এমন করে নষ্ট হয়ে যেত না। সে আমাকে বলেছিল - অন্যমনস্ক ভাবে বলে সে - বলেছিল - পার্টি করো, কিন্তু পার্টির জন্য জীবনপণ কোরো না। সে আমার জন্য ভাবতো, হয়তো সে বুঝেছিল আমার জীবনপণ করার মতো শক্তি নেই... কিন্তু আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

- আবহাওয়া একেবারে চ্যাবচেবে হয়ে গেল - কুন্তল চিৎকার করে উঠল –

যত সব আহাম্মকের দল, শালা, ফুর্তি করতে এসে এসব কি? এ্যাঁ? এসব কি? কথা ছিল সব ভাবনা চিন্তা বাদ, কিন্তু এখন এসব কি হচ্ছে? এ্যাঁ? কি হচ্ছে? চলো সব সমুদ্রের ধারে, চলো।

-- কটা বেজেছে? মোটে পৌনে আটটা? ঠিক হ্যায়, চলো ভাই, এই, চলো।

হিমেল বাতাস। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু সমুদ্রকে দেখা যাচ্ছিল না। রাস্তায় চড়া আলো, দুপাশে দোকান বসেছে। নানা রকম জিনিসপত্র, ঝিনুকের খেলনা। ভীড় না হলেও বেশ কিছু মানুষজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা পায়ে পায়ে পেরিয়ে এলো দোকানপাট। ঈষৎ এলোমেলো হাঁটার ভঙ্গি। পথ শেষে কংক্রিটের একটা ঢালু চাতাল, তারপর বালি, তারা দাঁড়াল। সামনে অন্ধকার, অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করছিল। অন্ধকার থেকে এগিয়ে আসছে চারটি আবছা মূর্তি, তাদের টুকরে কথোপকথনের শব্দ, তারা এগিয়ে আসে, স্পষ্ট হয় - সেই মেয়েটি, দুই ভাই, বাবা, মা। মুখোমুখি হলে সকলের সাথে চোখাচোখি। তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সময় ভদ্রলোক একটু ইতস্ততঃ করেন, সামনে এসে দাঁড়ান, বাকি তিনজন পেরিয়ে চলে যায়। ভদ্রলোক দ্বিধাগ্রস্থ গলায় বলেন - আপনি অমরের দাদা না? সে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে পড়ে, ঘাড় নাড়ে।

- আপনাদের মুখের অদ্ভূত মিল। সে যেন অন্ধ এভাবে ভদ্রলোকের হাত আঁকড়ে ধরে, বলে - আপনি অমরকে জানেন? সে বেঁচে আছে?

- কেন? আপনাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই? - ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

- না, - সে হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়ে।

ভদ্রলোক মুখ নীচু করে নেন, বলেন - অবশ্য আপনাকে সে ভালো চোখে দেখে না, এমন কি, এমন কি এরকম কথাও বলে - ভদ্রলোক দুবার ঢোক গেলেন, ইতঃস্তত করে বলেন - দাদা আমাকে ধরিয়ে দিতে পারে, টাকার

জন্য ও সব পারে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ, তারপর ভদ্রলোক মুখ তোলেন, বলেন - ওই আমার মেয়ে, ওরা রেজেস্ট্রী বিয়ে করেছে বছর দুই আগে। আপনার ভাই সম্বন্ধে আমার কিছু বলার নেই, ভাল ছেলে, ভাল মন, কিন্তু আমার মেয়ের কথা ভেবে আমি খুব চিন্তায় পড়ে যাই। তার ভবিষ্যৎ কি? মাসে দুমাসে এক একদিন অমর আসে, রাত্রে, লুকিয়ে, আবার রাতেই চলে যায়। খানিকক্ষণের থাকা, একটুআধটু কথাবার্তা, একটু খাওয়া দাওয়া করে, কোনোদিন তাও না। এ যে আমার কি অশান্তি।

- সে কি জানে সে কি চায়? - কর্কশ গলায় বলে সে - তাকে জিজ্ঞেস করবেন - নাকি শুধু আবেগ নিয়ে দৌড়চ্ছে? - সে মুখটা ভদ্রলোকের খুব কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়, বলে - বলবেন - তার দাদা লোচ্চা নম্বর ওয়ান, কিন্তু ভাইকে সে নিজের কলজের চেয়েও ভালবাসে - বলতে গিয়ে তার গলা ভারি হয়ে যায়, বলে - আর তার মা - তার মা কেঁদে কেঁদে পরশ-পাথর খুঁজে বেড়ায়, যে পাথর তার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দেবে।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে, ভদ্রলোক আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে যান।

হঠাৎ পিছনে ঝনন্ ঝন্ ঝনন্ ঝন্ ঝাঁজ বাজছে, চারজনেই পিছন ফেরে, তিন চাকা সাইকেল ভ্যানের ওপর সরস্বতী প্রতিমা, দুজন কিশোর ছেলে প্রতিমা ধরে আছে, একজন হ্যাজাক নিয়ে, আর একজন ঝাঁজ বাজাচ্ছে। তারা পাশ দিলো, ভ্যান এগিয়ে চলল।

ক্রমশঃ অন্ধকারে ওরা এগিয়ে যায় - হ্যাজাকের আলোর সীমানার মধ্যে চারজন কিশোর এবং প্রতিমা। হঠাৎ তারাও হাঁটতে শুরু করে, কেউ কোনো কথা বলে না। জল অনেক দূর সরে গেছে। ভ্যান যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, তারাও হাঁটছে তো হাঁটছেই, এভাবে একসময় ভ্যান থামল, তারা পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে একটু তফাতে দাঁড়াল।

চারজন কিশোর, হ্যাজাকটা জলের ছুটোছটি এলাকা থেকে একটু দূরে

রেখেছে। তারা প্রতিমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একে একে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করে, তারপর প্রতিমা নামিয়ে চারজন চার কোন ধরে জলে নেমে যায়, জলে ছুঁড়ে দেয়। একটা ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে আসে, মুহূর্তে ঢেউয়ের ভেতর থেকে ভেসে ওঠে প্রতিমার হাত - আশীর্বাদের মুদ্রা মুহূর্তে ভেসে উঠে জলে ঢাকা পড়ে যায়। শুকনো ফুল বেলপাতা এসব তারা জলে ফেলে দেয় আর ঘট ভরে জল নেয়।

চার কিশোর হ্যাজাকের আলোর সীমানা নিয়ে এগিয়ে যায়, ঝাঁজের শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। এখন তাদের চারপাশে গভীর অন্ধকার, আর অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করে।

অনিমেষ প্রথম কথা বলে - আমরা ঠাকুর বিসর্জন করে ঘট ভরে জল আনিনি তো?

- হয়েছে, বেশ হয়েছে, আমাদের আবার পুজো তার আবার ইয়ে - কুন্তল বলে - ঘট এনে প্যান্ডেলে রেখেতো কুকুরে মুত্ বে। তাছাড়া প্যান্ডেল ওলাকে কালকে রাতেই প্যান্ডেল খুলে নিতে বলা হয়েছেনা? নাহলে আজকে এরকম কেটে পড়া যেতো? আবার ঘটে জল ভরে এনে - আ - রে! আমাদের যখন ওই বয়স ছিল তখন আমরাও ওরকম ভক্তিটক্তি করেছি, নে নে, এখন মা সরস্বতীর কৃপায় কেমন ফুর্তি করছি! এখন আর মাকে অত না ডাকাই ভালো, অন্য দিকে মন আছে, আমরা কি করছি খেয়াল নেই, অতো ডাকাডাকি করলে যদি দেখে চাঁদার পয়সায় হুইস্কি তাহলে বলা যায়না হাত এরকম বেঁকে যাবে আর চাঁদার বিল লিখতে হবেনা।

অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায় না, শুধু পোষাকের আভাস। অনিমেষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বলে - তখনই বেশ ছিলাম। অথচ তখন মনে হতো কবে বড় হয়ে যাবো স্বাধীন হবো, নিজের ইচ্ছে মতো - পল্টু, তোর মনে পড়ে? তুই বলতিস বড়ো হয়ে নিই তারপর বাবার এরকম কড়াকড়ি দেখে নেবো।

সবাই চুপচাপ হয়ে গেছে। যেন কৈশোরের চার বন্ধু যৌবনে দাঁড়িয়ে কি যেন হিসাব মেলায়, অন্ধকারে সমুদ্র গর্জন করে।

- আমরা কি চেয়েছিলাম বলতো?

- কি জানি!

- আমরা কি চাই বলতে?

- কি জানি!

তারপর চুপচাপ। দূরে আলোক বিন্দুরা জনপদের নিশানা জানিয়ে ঝিকমিক করে, তারা চারজন টালমাটাল পায়ে অন্ধকার ঠেলে সেদিকে এগিয়ে চলে।

অনেক দূরে আলোক বিন্দুগুলির নিশানা ধরে তারা ফিরে চলে।

(রচনাকাল ১৯৭৬)

শোক

(রচনাকাল ১৯৭৯)

(এই কাহিনীর সব চরিত্র কাল্পনিক)

এক মিনিট দাঁড়ান, আজ এখানে একটা শোকসভা হবে। আপনি তো এ অঞ্চলের বাসিন্দা? তাহলে একমিনিট দাঁড়ান, আপনাদের জন্যই এখানে সভা করে শোক করবেন -

আজ এখানে সভা করে শোক করার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছি। এখনই তিনি এসে যাবেন। আমরা সৌভাগ্যবান, এখনই টেলিফান করা হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি জানিয়েছেন যে তিনি ঠিক চারটের সময় রওনা হয়েছেন, এখন পাঁচটা, তিনি এলেন বলে। এক মিনিট দাঁড়ান।

আজ এখানে সভা করে শোক করার জন্য আমরা আর একজনকে পেয়েছি তিনি আমাদের এম. এল.এ মহাশয়, ওই তিনি মঞ্চের ওপর বসে আছেন। আমাদের সৌভাগ্য আমাদের এম.এল.এ.আমাদের সঙ্গের সাথী। ওই তিনি আজকের সভায় উপস্থিত। আপনিও আসুন, একটু দাঁড়িয়ে যান, আজকের এই শোকসভায় যোগ দিন। দেখুন, কি সুন্দর মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। লাল টকটকে মঞ্চের ওপর দেখুন সকল স্থানীয় নেতারা কি ব্যস্ত। দেখুন, সারা মাঠ রাস্তা আর চারপাশের বাড়িগুলি হাজার নিশানে লালে লাল। একটু দাঁড়ান, আজ আপনাদের জন্য স্থানীয় নেতারা কিছু বলবেন, আমাদের এম. এল.এ. কিছু বলবেন, এবং বলবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। এঁরা সকলে আজ শোক করবেন। আপনি একটু দাঁড়ান, শোক সভায় সামিল হোন।

জানেন, ছোটবেলায় আমি ও বিজয় এই মাঠে খেলা করতাম। তখন এ মাঠের চারপাশে এতো বাড়ি হয়নি। তখন ওই দক্ষিণ দিকে একটা বাগান ছিল। অনেক বড় বড় গাছ ছিল। এই মাঠে তখন অনেক সবুজ ঘাস ছিল। আমরা গাছের তলায় আর সবুজ মাঠে কি যে করতাম! সেটা ছিল আমাদের

নিজস্ব রাজত্ব। সেখানে আমাদের কল্পিত রাজপ্রাসাদ ছিল, কোষাগার ছিল, অস্ত্রাগার ছিল, ছিল দুর্ধর্ষ সব ঘোড়া। সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে আসতো দৈত্য....

.....ওই বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ি এসে গেল। বিকেলের শেষ রোদ ব্যস্ত গাড়িটার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়েছে। উদগ্রীব জনতা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য ধেয়ে চলেছেন। ওই দেখুন, স্থানীয় নেতারা আর কর্মীরা ব্যস্ত ভাবে সকলকে সরিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্ঝঞ্ঝাট করছেন। জনতা যাঁকে ছবিতে দেখেন তাঁকে রক্ত মাংসের শরীরে দেখতে বড় আকুল হন। এইতো, আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মুখ্যমন্ত্রীর বড়সড় ছবি বেরিয়েছে। গতকাল তিনি কি যেন একটা উদ্বোধনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন - তার ছবি।

আমার কাছে বিজয়ের একটা ছবি আছে, বিজয় আর আমি একসঙ্গে। যখন আমরা কলেজে পড়তাম তখন একসঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম - বোটানিক্যাল গার্ডেনে - সেখানে কে যেন ছবি তুলেছিল - সেই বিখ্যাত বিশাল বটগাছের কাছে - সে ছবিটা আমি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি আমার আর কোনে ছবি কখনো তোলা হয়নি। বিখ্যাত সব লোকেদের জন্য ছবি তুলে দেয় ফটোগ্রাফার! বিখ্যাত লোকেরা তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন মনে করেন না কিন্তু আমাদের কাছে একটুকরো ছবি অনেক!

জানেন, আমার কিন্তু ধারণা ছিল বিজয় একদিন খুব বড় নেতা হবে। এম. এল.এ. হবে, মন্ত্রী হবে, বিজয়ের ছবি কাগজে কাগজে ছাপা হবে। তখন আমরা কলেজে পড়ি, তখন আমাদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিণত হয়নি। যেমন আমি, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতাম - আমি বি.এ. পাশ করেই একটা

ভাল চাকরি পেয়ে যাবো, তারপর আর কি - সুখের দিন!

তখন বিজয় ছাত্রনেতা ছিল। জানেন, তখন ও মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে উদ্দাম বক্তৃতা করত। তখন আমরা ভাবতাম - বিজয় একদিন বড় নেতা হবে, এম.এল.এ. হবে, মন্ত্রী হবে....

এসব কথা বিজয়কে বলতে গেলে বিজয় কিন্তু রেগে যেত। ভীষণ উত্তেজিত গলায় আমাকে ধমকাতো, বলত - তোদের বড় ছোট মন। আমাদের এই দরিদ্র দেশে পঙ্গু নীতিহীন শোষনে শোষনে - কি যেন একটা কথা বলত - হ্যাঁ - জর্জরিত দেশটাকে আমূল সংস্কার করতে হবে। আনতে হবে সাম্যবাদ। তখন শোষক-শোষিত থাকবে না, ধনী-দরিদ্র থাকবে না, মালিক-শ্রমিক থাকবে না, তৈরি হবে সর্বহারাদের সরকার, খেটে খাওয়া মানুষের দেশ, সকলের সমান অধিকার।

.... এমন সব অনেক কথা বলত বিজয়। তার শৈশবের সাথী আমি, যৌবনের বন্ধু, তার প্রতিটি কথা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতাম, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম। বিশ্বাস করতাম - এমন দিন আসবে যেদিন সকলে সমান করে ভাগ করে নেবে দুঃখ-সুখ। আপনি বিশ্বাস করুন, আমার বিশ্বাসে কোনো খাদ ছিল না। কিন্তু তারপর অনেক অ-নে-ক সময় পেরিয়ে গেছে, আজ আমি অনেক ধাক্কা খেতে খেতে বিজয়ের থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। আমি তার আদর্শে আস্থা রাখতে পারিনি। নিজে বাঁচবার আর পরিবারকে বাঁচাবার প্রশ্ন আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন? আর একটু দাঁড়ান, ওই শুনুন মাইকে গণসংগীত বেজে উঠেছে। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখুন গায়ক গায়িকারা সমবেত কন্ঠে গণসংগীত গাইছেন। ওই দেখুন মুখ্যমন্ত্রীকে ধবধবে নিষ্কলঙ্ক পোষাকে কী সুন্দর লাগছে। উনি গাড়ি থেকে নেমে মঞ্চের দিকে চলেছেন। জনতা তাঁদের প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আহ্, বিজয়ের আদর্শ নেতা আজ এখানে উপস্থিত। বিজয়ের কি ভাগ্য!

এটা উনিশশো উনআশি সাল, জানেন, বছর দুয়েক আগেও বিজয়কে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল। তখন অন্য রাজত্ব, অন্য সরকার - আঃ, আপনাকে আর নতুন করে কি বলব! আপনি তো যথেষ্ট বয়স্ক একজন ভারতীয় নাগরিক। আপনি অনেকবার ভোট দিয়েছেন, সব খবরই রাখেন। তখন জরুরি অবস্থা, সব কিছু ওই এক আইনে কুলুপ আঁটা। তাবড় তাবড় নেতারাও তখন টুঁ শব্দ করতে ভুলে গেছেন।

যাই হোক, বিজয়ের তখন আত্মগোপন পর্ব চলেছে। আমি তখন অনেক আগে থেকেই অন্য লাইনে চলে গেছি। আমার মনে পড়ে বিজয়ের প্রথম ধিক্কার -

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আমার না করে উপায় ছিলনা। তখন বাবা মারা গেছেন, বাবার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ক্রমশ শেষ হয়ে আসছে। বাড়ি ভাড়া, ভাই বোনেদের লেখাপড়া, এমনকি মায়ের পরনের কাপড়টুকু পর্যন্ত অনেক দূরের ব্যাপার, দুবেলা শুধু দুমুঠো খাবার জোগানো দায় হয়ে উঠেছে। তখন সেই বিভীষিকার ছায়া থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি ছটফট করছি।

একটা ব্যাপারে সকল সরকার কিন্তু এক নীতি নিয়ে চলেন। আপনাকে কি আর বলব, আপনি বয়োজেষ্ঠ সংসারী মানুষ, আপনি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে দেখে আসছেন এই রেশন ব্যবস্থা। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে,অনেক সরকার এলো গেল - এই রেশন ব্যবস্থা ঠিক আছে - বলুন? ওই রেশনের লাইন ধরে আমি অন্য লাইনে চলে গেলাম। কিভাবে হলো শুনুন - রেশনে যা চাল দেয় খেতে কুলোয় না। বাজারে অঢেল চাল, কিন্তু দাম অনেক। কিন্তু পেটতো মানেনা! আমি সেজন্য বাজার থেকে চাল না কিনে কিছু পয়সা বাঁচানোর জন্য বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে ' নন্ রেশনিং'এলাকায় যেতাম, সংসারের জন্য কিছু চাল কিনে আনতাম। এভাবে আমি দেখলাম অনেক লোক এ লাইনে করে খাচ্ছে। বেশিরভাগই খুবই

সাধারণ ছেলে ছোকরা বৌ ঝি। আমিও নেমে পড়লাম। অন্ততঃ বি.এ. টা না টুকেই পাশ করেছি, বুদ্ধিটা একটু পরিস্কার, ছোট ভাবে আরম্ভ করে আমি বুদ্ধির জোরে একটু প্রশস্ত হলাম।

তখন দেশে জরুরি অবস্থা বহাল। তখন সরকার পক্ষের সমর্থকদের পোয়াবারো। সব সুবিধাবাদী তালে তাল দিয়ে সেই সমর্থকের দলে ভিড়ে গিয়ে যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়া। আমিও তখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। আমি শিখে ফেলেছি কিভাবে ঠিক ঠিক জায়গায় ঘুষ পৌঁছে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরই ছত্রচায়ায় নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

তখন আমি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছি। আমার বেশ কিছু চ্যালাচামুণ্ডা জুটে গেছে। আমি মদের বোতল খুলতে শিখে গেছি। তা এই মদের বোতল গলায় উপুড় করতে গিয়ে চেলাদের সঙ্গে আমি একটা জিনিস আবিস্কার করলাম নিশচন্তে বসে মদ খাওয়ার জায়গার বড় অভাব। এ অঞ্চলে মদের দোকান আছে কিন্তু বসে খাওয়ার ' বার ' নেই।

অবশ্য চোলাই মদের কারবারের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি এ অঞ্চলে আছে। আপনি ভাল মানুষ, নির্ঝঞ্ঝাট ছাপোষা মানুষ, আপনি বিয়ার হুইস্কি কিংবা চোলাই মদের গন্ধও জানেন না, সেই আপনিও নিশ্চয় রোজ বাজার করতে গিয়ে পরিস্কার দেখেছেন বাজারে তিন চার জায়গায় চোলাই ঢেলে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে। কি বলছেন? লক্ষ্য করেছেন? না করবার কি আছে! যেখানে যা প্রণামী দেবার ওরা ঠিকঠাক পৌঁছে দেয়, সুতরাং ভয় কাকে বলুন? বাজারে এই চারটি চোলাই দোকানের মালিক চারজন, আর ওদের যে মাল যোগান দেয় সেই ছুন্নু মস্তান - এরা অনেক রথী-মহারথীকে বগলে পুরে রাখে - সুতরাং –

তা যাক্ চোলাই মদের কথা, আমি বিয়ার হুইস্কির কথা বলছিলুম - হ্যাঁ, নিশ্চিন্তে একজায়গায় বসে গলায় ঢালবার জায়গার বড় অভাব। অথচ অনেকে একটু আধটু মাল খেতে চায় কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই,

প্রথমতঃ জায়গার অভাব, দ্বিতীয়ত এক দু পেগ খেতে গেলেও পুরো বোতল কিনতে হবে, অনেকগুলো টাকার ব্যাপার। ভাবতে ভাবতে বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল আর আমিও কাজে লেগে পড়লুম, মোড়ের মাথায় একটা ঘর জোগাড় করে ' কোল্ড ড্রিঙ্কস ' আর বরফের দোকান খুলে ফেললুম। যতো সব ' ক্যাম্পাকোলা ' আর ' থাম্বস্ আপ ', ' ডবল সেভেন ' আর ' নোভা 'র বোতল সাজিয়ে, আর কাঠগুঁড়ো চাপা বরফের চাঁই রেখে পুরোদস্তুর দোকান খুললুম, ভেতরে পর্দা ফেলা সুন্দর একটা ছোট কামরা যেখানে বসে খদ্দেররা ঠান্ডা বোতল খাবে আর গল্প করবে।

এই মোড়ের কাছাকাছিই মদের দোকান, সেখান থেকে অনবরত বোতল কিনে ব্যাগে পুরে এ দোকানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। একজন চেলাকে মাইনে আর কমিশন দিয়ে দোকানে বসিয়ে দিলুম। এসব কারবার কিন্তু যথাযথ জায়গায় জানিয়েই শুরু করলুম। ঠিকঠাক ঘুষটুষ যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নিশ্চন্তে ঢালাও কারবার চলতে লাগল। আর খদ্দের? সে আপনি ভাবতেও পারবেননা, দিয়ে শেষ করা যায় না।

কারবারটা কিন্তু ছুন্নু মস্তান আর তার চার সাগরেদদের গায়ে জ্বালা ধরালো। হাজার হোক চোলাই কমদামী অচ্ছুৎ ছোটলোকের জিনিস, তায় আবার চোলাই করার ঝামেলা, অথচ আমার কারবার দামী, আর ফরেন লিকার! ঝকঝকে লেবেল মারা ' এরিস্টোক্রাট '!

ওরা আমাদের পেছনে লাগবার চেষ্টা করল। কিন্তু ওরা যেমন যথাযথ জায়গায় পুজো দেয় আমিও দিই, সেদিক থেকে কিছু করবার উপায় নেই, তখন করল কি দু-চারজন হারামি লোককে খদ্দের সাজিয়ে পাঠিয়ে আমার দোকানে গোলমাল বাধাতে চাইল।

কি যাচ্ছেতাই ঝামেলা বলুন! তোরা তোদের কারবার করছিস, আমি আমার কারবার করছি, তা আমার পেছনে তোরা শুধু শুধু লাগছিস কেন?

ও হো, আপনাকে বিজয়ের কথা বলছিলাম, এখন নিজের গল্পই

শোনাচ্ছি। হ্যাঁ, বিজয়ের বাড়ির অবস্থা কিন্তু ভাল নয়। ওর বাবা বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করেন, সামান্য মাইনে। বিজয় টুইশনি করে কিছু রোজগার করত, কিন্তু প্রাণের ভয়ে তখন আত্মগোপন করে আছে কোথায় কে জানে! এদিকে এলেই তার সর্বহারাদের পার্টি করার পিন্ডি চটকে দেবে গুন্ডা বাহিনী, কিংবা জরুরি অবস্থার আইনে সোজা লকআপ্ এ পুরে দেবে সরকার।

জানেন, আমি ওর জন্য এটুকু করতাম - কিছু কিছু টাকা বিজয়ের মায়ের হাতে দিয়ে আসতাম।

কিন্তু একদিন রাতে বিজয় আমার বাড়ি এলো,আমাকে ধিক্কার দিলো, তারপর বলল - আমার মা কে তুই টাকা দিবি না, তোর নোংরা টাকায় আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের দরকার নেই।

- তুই আলেয়ার পিছনে ছুটছিস বিজয় - বললাম আমি - এখন এই দেশটার প্রতিটি মানুষ শুধু নিজে গুছিয়ে নেওয়ার ধান্ধা করছে, তা যে কোনো পথেই হোক। কোথায় তোদের সংগ্রাম আর তোদের নেতাদের সংগঠন দেশের বনিয়াদ তৈরি করছে আমায় দেখা।

- তুই নোংরা মেখে আছিস, সেই নোংরা গন্ধে তোর নাক বুজে আছে - বলল বিজয় - তুই সুগন্ধ খুঁজে পাবি না। কিন্তু আছে, সুগন্ধ আছে, দেশ একদিন ঠিক গড়ে উঠবে, সেদিন তোরা সকলের পায়ের তলায় পিষে মরে যাবি - বলতে বলতে বিজয় আবার রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আমি সেদিন অনেক মদ খেলাম, নিজেকে, বিজয়কে ভুলতে চাইলাম।

দেখুন দেখুন, মুখ্যমন্ত্রীকে, উনি সাদা ফুলের কী বিশাল স্তবক শহীদ বেদীতে সাজিয়ে দিলেন। জনতা উদ্বেল হয়ে আওয়াজ তুলল, মুখ্যমন্ত্রী হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বললেন। তাঁর প্রসারিত দক্ষিণকরে কী বরাভয়! জনতার বুক ভরে উঠল। শুনুন, উনি দুমিনিট নিরবতা পালন করতে বলছেন। আসুন আমরা দু মিনিট নীরবতা পালন করি। আজ এই শোক

সভার জন্য অনেকে অনেক কিছু করেছে। যেমন ছুন্নু আর তার সাগরেদরা বাজারের চোলাই দোকান ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলেছে। ভর্তি তো দূরের কথা একটা ফাঁকা বোতলও রাখেনি। এই তো দু পা গেলেই বাজার, আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়েই দেখে আসুন!

আজ আমার ঠান্ডা পানীয়ের দোকান বন্ধ। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে শোকসভা করছেন, আজ এখানে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ, আজ যথাযথ জায়গা থেকে আমাদের ওপর নির্দেশ এসেছে কারবার আজকের মতো বন্ধ রাখার জন্য। আজ বিজয় এসে দেখে যাক,অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও আমি ভাল হয়ে গেছি। এক পেগ মদও সারা দিনে বিক্রি করিনি।

বিজয় বারণ করলেও আমি ওর মাকে টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু জানেন, ওর মা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন, বিজয় নাকি বলেছে তুমি নোংরা পথে টাকা রোজগার করো, আমরা ও টাকা নোবোনা বাবা, তুমি কিছু মনে কোরোনা। বিজয় বলে গেছে কিছুদিন কষ্ট করতে। বোধ হয় জরুরি অবস্থা উঠে যাবে, ভোট হবে, তখন সে বাড়ি আসবে, আবার কিছু না কিছু রোজগার করবে।

তাই হলো। আপনি তো জানেন কোথা দিয়ে কি যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল, দেশে ভোট হলো, জনসাধারণ আবার ভোট দিল। পালটা নেতারাও এতটা ভাবতে পারেননি, কারণ একবার জনসাধারণের ভোটে সরকার গড়ে তাঁরা নিজেদের মধ্যে যে খেয়োখেয়ি করেছিলেন সেই লজ্জাজনক ঘটনার কথা কেউই ভোলেননি।

কিন্তু জনসাধারণ আবার তাঁদের সুযোগ দিলেন। সারা দেশ জুড়ে নতুন ঢেউ। জরুরি অবস্থা নেই, পীড়ন নেই - বিজয় ফিরে এলো।

আমরা কিন্তু ভয় পেলাম, ভাবলাম, এবার আমাদের কারবার উঠল। যথাযথ জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের অভয়বানী শোনানো হলো - একটু

রয়েসয়ে চালিয়ে যাও, কিছু ভয় নেই। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। কারবার যথারীতি চলতে লাগল, তফাতের মধ্যে আগে যেসব স্থানীয় নেতাদের তেল দিতাম এখন আর তাদের পাত্তা দিই না। এখন বিজয়দের পার্টি সরকার গড়েছে সুতরাং সেসব নেতাদের তেল দিতে চেষ্টা করি। বিজয়কেও আমি একটু তেল দিতে চাইতাম, কিন্তু বিজয় আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যেত, তার মুখে ঘৃণা ফুটে উঠত। তাই আমি ওকে এড়িয়ে চলতে থাকলাম। যাতে না মুখোমুখি পড়ি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতাম। বিজয়দের পার্টি সরকার গড়েছে, বিজয় যদি বিরূপ হয়ে আমার পিছনে লাগে তাহলে কারবারটা যাবে। যদিও যথাযথ জায়গায় ঠিকঠাক ঘুষ দিয়ে চলেছি তবু কি দরকার! কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

উচ্ছাস থিতিয়ে এলে সবকিছু আবার আগের মতোই চলতে লাগল। জানেন, কোনো পরিবর্তন নেই। এ সরকারের মন্ত্রীরাও আগের সরকারের মন্ত্রীদের মতোই চলতে লাগলেন।এ সরকারের অধীনে সরকারী কর্মচারীরা আগের সরকারের অধীনে সরকারী কর্মচারীদের মতই চলতে থাকল। এ আমলের মালিক শ্রেণী আগের আমলের মতোই চলতে থাকল। এ আমলের চোরাকারবারীরা আগের আমলের মতোই - আপনি হাসছেন? হাসবেননা, আজ এখানে একটা শোকসভা হচ্ছে। দুমিনিট নিরবতা পালন হয়ে গেছে, এখন স্থানীয় এম.এল.এ. মহাশয় বক্তৃতা করছেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ, দেখুন জনতা কেমন উদগ্রীব হয়ে বক্তৃতা শুনছে।অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন পার্টির কর্মীদের এখন আত্মগোপন করে থাকতে হয় না। এখন আর জরুরি অবস্থার হুমকি নেই। বিজয় আবার ট্যুইশনি করতে পারছে এবং বেকার ভাতা পাচ্ছে মাসে মাসে।

অবশ্য এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমার কারবার দারুণ চলছিল, বছর ঘুরলেই জমি কিনে বাড়ি করবার উদ্যোগ করলাম। মায়ের ইচ্ছা এবার আমি বিয়ে করি, আমারও ইচ্ছা, বাড়িটা তৈরী হলেই

বিয়ে করে ফেলব।

ছুন্নুরা বেশ শান্ত ছিল। আমার পিছনে আর বিশেষ লাগত না। কিন্তু আমি যেই বাড়ি করতে শুরু করলাম তখন ওদের ভীষণ আঘাত লাগল। এত বড় বাড়ি তৈরি করছি! ব্যাটারা যেন ক্ষেপে গেল, রোজ আমার দোকানে হামলা করতে লাগল।

আমি অনেক সহ্য করলাম, জানেন, কিন্তু কাঁহাতক আর পারা যায়? একদিন আমি চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে আর কিছু গুন্ডা জুটিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাজারে ঢুকে চারটে দোকান তছনছ করে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা জমাটি কারবার, অনেক মাল নষ্ট হলো। এইতো কদিন আগের ব্যাপার, দু হপ্তাও হয়নি। কিন্তু আমি একটু ভুল করেছি, আমার উচিত ছিল ছুন্নুকে একেবারে শেষ করে দেওয়া। তাকে শেষ করে দিলে সে আর এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাতে পারতো না। আমি খুব ভুল করেছি, খুব ভুল করেছি!

আমদের একহাত নেওয়ার জন্য ছুন্নুরা তাল খুঁজছিল। আমিও একটু সাবধানে ছিলাম। বাজারে চালের দোকানে কদিন যাইনি। কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই, কারবারটা যে ছোকরাকে দেখতে দেওয়া আছে সে ব্যাটা চুরি করে ফাঁক করে দেবে। পরশু দিন আমি দুটো চেলাকে নিয়ে বেলা নটা নাগাদ বাজারে গেলাম। ওরা তৈরিই ছিল, আমি পৌঁছনা মাত্র লাঠিসোঁটা ছোরাছুরি নিয়ে ঘিরে ধরল।

আমার সঙ্গেও চেম্বার থাকে, জানেন, অটোমেটিক, আমার নিশানাও নিখুঁত, গুলি চালালে কোনো বাছাকে আর ফিরতে হবে না! আমি চেম্বার হাতে নিলাম - ওরা একটু থিতিয়ে গেল, কিন্তু শুরু করল গালাগালি আর তড়পানি। সে একটা বিশ্রী ব্যাপার, চারিদিকে থৈ থৈ লোকজন, সকাল আটটা থেকে বাজারের সময় - ও, আপনি তখন বাজারে ছিলেন? দূর থেকে দেখেছেন?

বিজয়ও বাজার করতে এসেছিল, জানেন,সব জায়গায় কর্তালি করা

ওর অভ্যাস। এখন আবার ওদের সরকার, সুতরাং ওর এরকম ধারণা যে সব জায়গায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শান্তি রক্ষা করায় ওর অধিকার। আরে আহাম্মক, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা সব বিক্রি হয়ে গেছে বাজারে, তুই কিংবা তোর মন্ত্রীদের চোদ্দগুষ্টি কিচ্ছু করতে পারবে? খামোকা আগ বাড়িয়ে এসে কর্তালি শুরু করল - তোমরা কেন এখানে ঝামেলা করছ - ইত্যাদি।

আমি বিজয়কে এড়িয়ে চলি, তাই আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লাম, আমার চেলারাও আমাকে অনুসরণ করল। কিন্তু ছুন্নুর চার সাগরেদ খুবই ক্ষেপে গেল, এক তো শিকার হাতছাড়া, দুই বিজয়ের কর্তাপনা।

আঃ, আমি যদি চলে না যেতাম! যদি আমি বিজয়কে সরিয়ে দিতাম, যদি গুলি করে শেষ করে দিতাম ছুন্নু আর তার সাগরেদদের!

তারপর নাকি বিজয়ের সঙ্গে অনেক বচসা হয়েছিল ওদের, চারিদিকে প্রবল জনতা ঘিরে ধরেছিলে ওদের।অনেকেই বিজয়কে চেনেন, মানেন, তাঁরা বিজয়কে সমর্থন করছিলেন। বিজয় আরও জোর পেয়েছিল, বলেছিল - আমি তোমাদের চিনি, তোমরা বাজারে মদ বিক্রি করো, গরীব মানুষদের মেরুদন্ড ভেঙে দিচ্ছ তোমরা - এইসব অনেক বক্তৃতা - আমাকে একজন এসে চুপিচুপি জানিয়ে গেল। ওরা তখন মরিয়া, একজনের কাছে ব্যাগে কয়েকটা হাতবোমা ছিল, একটা বোমা সোজা চালিয়ে দিল বিজয়ের মাথায়, তারপর এলোমেলো এদিক ওদিক বোমা ছুঁড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে পালালো। জনতা তাদের ধাওয়া করেছিল।জনতা একজনকে ধরে পিটিয়ে মেরেছে। বাকিরা বেপাত্তা। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি।

এক মিনিট দাঁড়ান। আজ এখানে একটা শোকসভা হচ্ছে। আপনি বিজয়কে চিনতেন? দেখবেন তার ছবি? আমার বুকপকেটে একটা ছবি আছে, বিজয় আর - না, আপনাকে সে ছবি দেখতে হবে না, সে ছবিতে

বিজয়ের পাশে আমি আছি।

শুনুন মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন। দেখুন ওঁর উজ্জ্বল মুখ। কি দুরন্ত ওঁর কণ্ঠস্বর! ওঁর বক্তৃতা শুনুন। আজ এখানে ওঁরা সভা করে শোক করতে এসেছেন। আপনি শুনুন, দেখুন, ওঁদের শোক অনুভব করুন।

আমি চলি, শুনছেন? আমি চলি। আমার এখানে দাঁড়াতে ঘেন্না করছে। আমি একটু আগে আর এক শোকসভায় গিয়েছিলাম, নিঃশব্দে গিয়েছিলাম, নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছি। সেখানে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন এক জননী, তাঁর চারপাশে এক বৃদ্ধ আর তিনটি কিশোর কিশোরী শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ঘিরে বসে আছে।

তুই কোন সর্বহারার রাজ্যে চলে গেলি বিজয়? তোর মাকেও একবার বলে গেলি না?

(রচনাকাল ১৯৭৯)

বিষন্ন বিহগ

(রচনাকাল ১৯৭০)

অফিসের ঘর সবসময় বুকে একটা ভারী হাত চাপা দিয়ে রাখে মনে হয়। বাইরে রোদ্দুরে যখন সব কিছু ধুয়ে যায় নির্বিঘ্নে তখন কমলের মাথার ওপর ঠায় আলো জ্বলে থাকে। কখনো মেঘ ঘনিয়ে এলে বা অঝোরে বৃষ্টি - কোনে সময়ই আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন নেই। রেকের ফাঁকে ফাঁকে কাগজের গন্ধ আর টেবিলে ছড়ানো থাকে হাজার বছরের পুরোনো ম্যমির মতো হাত।

এই ম্যমির মতো বিবর্ণ হাতে আমি সব কাজ করে চলেছি - কমল ভাবল - অর্থহীন যত কাজ, মৃত্যুর প্রতীক, মৃতের মতো অসাড় হাতে, অর্থহীন, অথচ আমার এমন কিছু এই হাতে - উল্লেখযোগ্য - কি রকম কাজ? কি কাজ? আমি ঠিক বুঝতে পারিনা - মনে হয় সেটা বৃক্ষ রোপনের মতো কিছু - একদা যা বিশাল হয়ে উঠবে, পাতায় শাখায় ফুলে ফলে, ঘন ছায়ায় ঢাকবে পাদমূল, আশ্রয়ের আশ্বাসের মতো ছায়া....অথচ সবকিছু কেমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে দিয়ে চলে যাচ্ছে হাত এড়িয়ে.... অথচ হাজার বছরের পুরোনো ম্যমির মতো হয়ে গেছি আমি - কমল ভাবল - কোথাও কোনো অনুভূতি বেঁচে নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে কমল বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়ে শরীর বাঁকিয়ে উঁচু উঁচু রেকের বর্ডার - মাঝে মাঝে গলিপথ - এ সবের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ গলিপথ পেরিয়ে এসে অবশেষে জানলা পেল। জানালায় ভর দিয়ে কমল বাইরের দিকে তাকাল। বাইরে বৈশাখের খর রৌদ্র ঝন্ ঝন্ করছিল।

প্রত্যেকটি পথিক যারা হেঁটে যাচ্ছে অথবা বাসের ট্রামের জানালায়

যাদের মুখ, অথবা পান সিগারেটের দোকানদার অথবা ঠেলাওয়ালা রিক্সাওয়ালা যত জনের মুখ দেখল কমলের মনে হলো প্রত্যেকেই ক্লান্ত এবং রৌদ্রের প্রতি বিমুখ। বস্তুত এই তীব্র রৌদ্র হতে সকলেই যেন কোনক্রমে পালাতে চাইছিল। এতৎসত্বেও কমলের মনে হলো এই রোদ্দুরে গা ভাসাতে পারলে ভাল লাগত।

এসব ভাবতে ভাবতে যেন অসাড় হয়ে জানালায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল কমল, কৌশিক এসে প্রায় তার গায়ের ওপর দাঁড়াল, বলল - আপনার ফোন কমলদা - ওর চোখে হাসি ছলছল করছিল, মুখে হাসি ভেসে যাচ্ছিল।

এক ধরণের মানুষ আছে পৃথিবীতে যারা সবসময় খুশি।অতি সহজে সকলকে দাদা বলতে পারে, চনমনে ছটফটে। কমল এখন বুঝতে পারল কে ফোন করেছে, সে কৌশিকের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল। তার ভাল লাগছিল না, জানালা থেকে অতদূরে টেবিলে যেতে তার ক্লান্তি আসছিল, তথাপি সে যান্ত্রিক নিয়ম মত যেন টেবিলে এলো, রিসিভার হাতে নিল - কথা না বলেই রেখে দিলো। - দাদা! - কৌশিক প্রায় আর্তনাদ করে উঠল।

এখন মধ্যদিন। রাস্তায় নামল কমল। অফিসে তার ভাল লাগছিল না। আজ আর অফিসে ফিরবে না, সে ঠিক করে ফেলল রাস্তায় নেমেই । অতসী, তুমি আমায় ক্ষমা করো, আমার আর কিছু ভাল লাগেনা, আমি হাজার বছরের পুরোনো ম্যমি হয়ে গেছি - কমল মনে মনে বলল।

কোনো কোনো সূর্যাস্ত বেলায় রৌদ্র কেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, অথচ উত্তাপ থাকেনা। বিশেষতঃ বর্ষণ শেষের বেলায় সেই সোনার মিনের মতো রোদ্দুর তাল গাছের মাথায় - দীর্ঘ সব ছায়া ফেলা তালগাছ ঘাসের ওপর শুয়ে,স্ফূর্তির মতো বাতাস সর্ সর্ করে, অনেক সব গাছপালা ছটফট করে, পাখপাখালি নানা শব্দ করে উড়ে উড়ে চলে যায়, সেইসব কৈশোরের গ্রামে ফেলে আসা বৈকাল সহসা একবার কমলের বুক ছুঁয়ে চলে গেল দীর্ঘ ডানা ছড়ানো সাদা বকের মতো - এই শহরের কোনোখানে কোনো বিচিত্র

বৈকালের মুখচ্ছবি নেই - এই সব ভাবল কমল।

অথচ কি যেন খুঁজতে খুঁজতে কমল কঠিন রৌদ্রে শহরের পথে পথে ঘুরতে লাগল। দীর্ঘক্ষণ পর মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের মতো শব্দ ও যন্ত্রণা অনুভূত হলে কমল সচেতন হলো এবং দেখল সে দীর্ঘ সময় ডালহৌসী স্কোয়ারের কয়েকটি পথে বারবার ঘুরছে। তখন সে ময়দানের দিকে হাঁটতে থাকল, তারপর সে গঙ্গার বাতাস পাচ্ছিল। তখন তার পা টলছিল, ঘাসের মাঠে নেমে কমল শুয়ে পড়ল। খুব দ্রুত পর পর অনেকগুলি বিস্ফোরণের শব্দ তার মাথার মধ্যে - কমলের কষ্ট হচ্ছিল, প্রায় অচেতন অবস্থার মধ্যে তার মনে হচ্ছিল সে একটা মশাল হাতে নিয়ে ঘন অন্ধকারে ঢাকা এক মাঠের মধ্যে দিয়ে চলেছে, উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো মাঠ, পথ নয়, পা পড়ছে এলোমেলো আর অনেক দূরে দূরে গ্রামের আভাস, সে ওই গ্রামগুলির কোনো একটিতে পৌঁছাতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না, শুধুই ঘুরছিল কমল, শুধুই ঘুরছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কমল, এবং শান্ত হতে চাইল....

সন্ধ্যাকাল। বাড়ি পৌঁছল কমল। বাইরের ঘরে আলো। নন্তু - ছোট ভাই - ক্লাস নাইনের ছাত্র, উচ্চৈস্বরে অধ্যয়ন রত - কমল কাহিনীটি অনুধাবন করছিল - সমুদ্রে উত্তাল সব ঢেউ, ছোট্ট মেয়ে কাঁদছিল, মাঝিকে বাপ শুধায় কেমন করে শান্ত হবে ঢেউ - ইত্যবসরে কমল ঘরে ঢোকা মাত্র নন্তু চিৎকার করে উঠল - দাদা, আনন্দদা মার গেছে।

ওপাশে রান্নাঘর থেকে মা চেঁচিয়ে উঠল - আঃ, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই - একটু জিরুতে দে - শেষে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে মা থেমে গেল। কমল ঠিক বুঝতে পারছিল না, তার মাথা পুনরায় ঝিমঝিম করে উঠল। মা এগিয়ে এসে বলল - আর ব্যস্ত হবার কিছু নেই রে, সে সব গতকাল রাতে ঘটে গেছে। তুই জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে, সমরেশ বলে একটি ছেলে এসেছিল খবর দিতে, আহা রে বাছা!

আনন্দ মফস্বলের এক স্কুলের শিক্ষক ছিল।হোষ্টেলে থাকত। তার বাল্যকালের বন্ধু আনন্দ। বাবা মা মারা যাবার পর সংসারে সে একা ছিল। গত কাল শেষ রাতে সে সহসা অদ্ভুত বুকচাপা আওয়াজ করে উঠেছিল, তখন ঘরের অপর সহবাসী সমরেশ তাকে অসহজ অবস্তায় দেখে সকলকে ডাকাডাকি করে - ডাক্তার ডাকে, কিন্তু তখন আনন্দ মৃত। মুহূর্তে নিশ্চিত নিদ্রার মাঝে মৃত্যু সত্বেও তাকে পুলিশ লাশ কাটা ঘরে নিয়ে গেছে। কাঁটাপুকুর নামক কোন এক জায়গার মর্গে। আগামীকাল সকালে সেখানে কমলকে উপস্থিত হওয়ার জন্য বলে গেছে সমরেশ।

সব কিছু শোনার পর কমল হাত মুখ ধুয়ে পাজামা পরল, চা ও খাবার খেলো, টেবিলে পা তুলে পাখা চালিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসল। তারপর রাত্রি হলো, তারপর কমল রাতের খাওয়া শেষ করে ঘুমোতে গেল। খুব শীঘ্রই সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সম্ভবত সে খুব ক্লান্ত ছিল।

.... তারপর অনেক রাতে কমল এবং আনন্দ বন বাদাড়ে দাপাদাপি, বড় শীত শীত বাতাস, তারা দুজনে বাঁশ বনে পাতা জড়ো করে আগুন লাগিয়ে গা গরম করছিল - সহসা আগুন নিভে গিয়ে চতুর্দিকে ধোঁয়ায় ভরে গেল, কমল দেখল আনন্দ ধোঁয়ার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে ডাকতে চাইল কিন্তু তার কন্ঠ শব্দ করতে পারছিল না - আনন্দ কেঁদে উঠল - কমল ওরা আমার শরীর চিরে ফেলবে বলছে - কারা কারা? - কমল চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার কন্ঠনালী কে যেন চেপে ধরেছে - কমল ছটফট করে উঠল - তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে গভীর অন্ধকার.... সমস্ত পৃথিবী শূন্য....এই বিশাল শূন্যতার গভীর অন্ধকারে একাকী কমল অসহায় বোধ করছিল....

একদিন কমল একটি পত্রিকায় একটি গল্প পড়ছিল। পড়তে পড়তে তার মনে হলো গল্পের মধ্যে নানা কথায় সে খুঁজে পাচ্ছে সেই সব শৈশব ও কৈশোরের বাক্সে তুলে রাখা গরমের পোষাক যেগুলি এখন মাপে আশ্চর্য

রকমের ছোট মনে হয় অথচ হাতে নিলে গন্ধ নিলে কেমন যেন ছুটোছুটি করে আসে সেই ফেলে আসা বাল্যকালের পৌষের সকাল....উষ্ণ মিঠে রোদ্দুর... পুকুরের জলে ঝিলমিল আলো.... খেজুরের গুড় মাখা মুড়ির গন্ধ, এমনকি চিটচিটে আঙুল পর্যন্ত - যেন এইতো আছে কাছাকাছি কোথাও আড়ালে - এ গল্পটি তার নিজেরই ছোটবেলার গল্প মনে হচ্ছিল। তখন তার আনন্দকে মনে পড়ল। সে আশ্চর্য হয়ে গেল যখন সে দেখল লেখকের নাম আনন্দ স্যানাল। অতঃপর পত্রিকার অফিসে গিয়ে সে লেখকের ঠিকানা যোগাড় করল।

এক ছুটির দিন দুপুর বেলা কমল সেই ঠিকানায় পৌঁছতে এক মফঃস্বলের বাসে চাপল। তখন বসন্তকাল, দুপুরের রৌদ্র ঈষৎ উষ্ণ, পড়ন্ত বেলায় কমল যেখানে পৌঁছাল সেটা শহরের গন্ধলাগা একটি গ্রাম, সেখানে আনন্দকে পাওয়া গেল। একটি ছোট ছেলে দেখিয়ে দিল আনন্দকে।

এক কৈশোরের গুটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া দুই যুবক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীর্ঘ পনেরো বছর পর পরস্পরের সত্তা অনুভব করতে চাইল।

দুই বন্ধু কি কথা বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না। পড়ন্ত বেলায় তারা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। পুকুরের পাশ দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথ ইঁট ঢাকা, পুকুরের জলে আশ্চর্য গলিত রৌদ্র ভাসতে দেখল কমল, অশথের পাতায় উথলে পড়া খুশি দেখল কমল। ক্রমশ তারা গাছগাছালি ঢাকা পাখপাখালি ডাকা ও ঝিঁঝিঁর শব্দপূর্ণ এক নির্জন সরু পথ দিয়ে নদীর ধারে পৌঁছাল। ঘাটের রাণায় পা ছড়িয়ে বসে তারা অনেকক্ষণ চুপচাপ সময় কাটাল।
কমল দেখছিল শীর্ণ এক অপুষ্ট যুবক, অথচ কি আশ্চর্য উজ্জল দুই চোখ। আনন্দ দেখছিল আকর্ষনীয় সুন্দর এবং স্বাস্থ্যোজ্জল তার বন্ধু, অথচ কি ম্রিয়মান দৃষ্টি! সেদিন তারা দুজনে কেউ কোনো কথা বলল না। ভাঙাঘাট, জলের শব্দ, অলস নৌকা, পাখির কিচিমিচি নৈশব্দ পূর্ণ করছিল। মধুর বাল্যকাল। চিত্রিত কৈশোর। দুই বন্ধু দেশবিভাগের বিভৎস

উৎসবে বিচ্ছিন্ন। কত দিন ধরে কত দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে। সেই মুখ চোখ হাসি অভিব্যক্তি অপরিবর্তিত। দুই মানুষ -তাদের আবার নতুন করে বন্ধুত্ব করতে হবে। তবু কোথা যেন কিছু আছে! কোনো অদৃশ্য সময় স্থির ছিল সঙ্কেতের অপেক্ষায়। সুতরাং আলোকরশ্মি এসে পড়ে।

শেয়ালদা স্টেশনের চরমতম দিনগুলির কথা বলেছে আনন্দ। তারপর বস্তি - অন্ধঘর - কুন্ঠিভ আলো - অচ্ছুৎ বাতাস - আকাশের কোনো রঙ নেই - জীবনের কোনো বাতায়ন নেই - মা শীর্ণ - বাবা জীর্ণ ক্লান্ত - তবুও ক্ষুধা - সুতরাং - তারপর - এবং প্রচেষ্টা - দিন মাস বৎসর - চলে যায় - কেমন করে চলে যায় - আরও কত নিকৃষ্ট ভাবে বাঁচবে অমৃতের পুত্র মানুষ! কি জন্য বেঁচে আছো? কেন বেঁচে আছো? কি নিয়ে বেঁচে আছো? শুধু বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে আছো! সারাদিন বাসন মেজে মেজে মায়ের হেজে যাওয়া হাত, বাবার রোগাক্রান্ত কোটরাগত চোখ, অর্ধাহার ক্লিষ্ট জীর্ণ দেহ - এবং মৃত্যু - এবং শেষ - এবং শান্তি! সমগ্র পরিবারের খাদ্য খেয়ে বেঁচেছিল শকুনি - প্রতিশোধের জন্য - দুইজন মানব-মানবীর মৃত্যুদূত আমি কে বেঁচে আছি? কেন বেঁচে আছি? এই বিশাল পৃথিবী - আহা সুন্দর পৃথিবী - আমি কি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবো বলে বেঁচে আছি?

....তবু আমি বাঁচতে চাই কমল। এই আশ্চর্য পৃথিবীর জন্য বাঁচতে চাই। এই আশ্চর্য মানুষের জন্য বাঁচতে চাই। এই আশ্চর্য আমার জন্য বাঁচতে চাই। আমি বাঁচতে চাই কমল....

ক্রমশঃ কমল অনুভব করছিল তার জীবন থেকে কি যেন হারিয়ে গেছে। সেটা কি? কি সেটা কমল বুঝতে পারছিল না।

তুলনামূলক ভাবে কমল তো অনেক সুখী। মোটামুটি স্বচ্ছল সময় - স্কুল কলেজ, তারপর চাকুরী - অভাবের আঁচ গায়ে লাগেনি - ছোটখাটো বাড়ী - ব্যাঙ্কে কিছু টাকাও রেখে গেছেন বাবা - এরপর একটা বিয়ে - আনুসঙ্গিক - ইত্যাদি - তারপর সন্তান পালন - বেবিফুড - অয়েলক্লথ –

দোলনা - এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ - এইতো অতসী - সুন্দর মুখ সুন্দর দেহ - অথচ আমি এক ম্যমির মতো, ম্যমির মতো আমি পিরামিডের নীচে - আলোর উৎসগুলি বন্ধ - ঠিক! আলো! কোথায় যেন একটা বন্ধ জানালা আছে, মনে হয় খুললেই আলো - রোদ্দুর - উদ্ভাসিত শিহরিত - অঙ্কুরোদ্গমের কি কোনো মন্ত্র আছে?

ভোর হয়ে আসছিল।কাকের কর্কশ শব্দ শুনল কমল। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে তার পিঠ ব্যাথা করছিল। আনন্দ বড় সজীব ছিল। আনন্দ বড় তিরস্কার করত কমলকে। সে তার প্রতিটি অনুভূতির স্বাদ কমলের অনুভূতিতে সঞ্চারিত করতে চাইত। নতুন বন্ধুত্বে আনন্দ বড় ভালবেসেছিল কমলকে। মাঝে মাঝে সে দুঃখ প্রকাশ করত, কষ্টবোধ করত নিস্পৃহ অনুভূতিহীন কমলের জন্য। একদিন সে অতসীকে নিয়ে এলো - তার মামাতো বোন, কলকাতার দক্ষিনাঞ্চলে থাকে, গরিব ঘরের শান্ত সুন্দর মেয়ে চুপিচুপি বলল - তোমাকে একটি দুর্লভ পুষ্পোদ্যান উপহার দিলাম।

অতসী, তুমি কি জানো আনন্দ মারা গেছে? কথাটা বিড়বিড় করে বলল কমল, তার কেমন হাসি আসছিল। সে ফুঃ ফুঃ করে দুবার শব্দ করল এবং বিছানা থেকে নামল। একটা বেড়ালছানা ঘরের মেঝেয় গুটিশুটি ঘুমোচ্ছিল - তাকে এক লাথি মারল।

কাঁটাপুকুর কোথায় কমল জানেনা। সেখানে লাশকাটা ঘর কেমন কমল জানেনা। তবু কমল সকালের রোদে গা পুড়িয়ে একসময় সেখানে পৌঁছাল। সমরেশ সেখানে উপস্থিত ছিল, আনন্দর আরও কজন সহকর্মী ও প্রধান শিক্ষক। বেলা দশটা পর্যন্ত তারা সেখানে চুপচাপ অপেক্ষারত।

কেমন অর্থহীন অপেক্ষা। মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো চিন্তা নেই, শুধু এক মৃতদেহ। কখনো দাঁড়িয়ে কখনো বসে কমল ভাবতে লাগল মৃতদেহ দেহমৃত - অমৃতপুত্র আনন্দ - আমি বাঁচতে চাই আশ্চর্য আমার জন্য - অথচ মৃত! আশ্চর্য মৃত আনন্দ! কতশত মানবপুত্র ঠিক ঠিক বেঁচে, আনন্দ অকালে মৃত!

বেশ বেশ! বড় বাঁচতে চেয়েছিলে, এখন দেখো সবাই এসেছি তোমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে। দেখি কি করে পালাও! আচ্ছা, আগে কেটে কুটে ছিঁড়ে খুঁড়ে দেখে নিই কোথাও লুকিয়ে আছো কি না!

কমলের খুব হাসতে ইচ্ছা করছিল। ডোমেদের একটা ল্যাংটো বাচ্ছা ঘুরঘুর করছিল, তার পেটে একটা জোরে চিমটি কাটল। ছেলেটি ক্যাঁক করে চিৎকার করে উঠলে কমল হো হো করে হেসে উঠল। সকলে সচকিত হয়ে ওঠার মুহূর্তে যমদূতের মতো একটি লোক এসে জানালো বিকালের আগে লাশ পাওয়া যাবে না।

সেই দূর মফঃস্বলে ওরা এখন ফিরে যাবে না, ওরা আলোচনা করছিল কোথায় যেন ওরা বিশ্রাম করবে, চান খাওয়া দাওয়া করবে।

কমল হাঁটতে শুরু করল। এখন বাড়ি যেতে হবে। - ভাবল কমল। সুতরাং সে বাড়ি যাচ্ছিল। বাড়ি একটা অভ্যাস - ভাবল। কোনো বাস অথবা ট্রাম দাড়াঁচ্ছিল না। দুরন্ত ভীড় দেখে ওর মনে হলো এটা অফিসের সময়।....আজ আমি অফিস গেলাম না। কেন? একটা কাজ রয়েছে। কোনো দিন কি এরকম হয়েছে শুধু শুধুই আমি অফিস গেলাম না? হয়নি। একটা কারণ না থাকলে আমরা অফিস যাবই। অফিস একটা অভ্যাস।...একটা মৃতদেহ সৎকার - একটা সংস্কারের অভ্যাস - ভাবতে ভাবতে সে হাঁটতেই থাকল।

অনেক রাস্তা ধরে কমল হেঁটে চলল।কখনো ট্রামলাইনের ধার দিয়ে, কখনো ফুটপাথ দিয়ে, কখনো রাস্তা পেরিয়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছিল সে। একসময় একটা চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হলো এখানটা তার চেনা। ফুটপাতের ওপর বাঁধানো ছাদসহ বাসষ্ট্যান্ড। একটা অত্যন্ত জীর্ণ শরীর নারী অথবা পুরুষ কিছু একটা হতে পারে - উপুড় হয়ে পড়েছিল, তার কোমরে জড়ানো ঐতিহাসিক কাপড়ের ছিন্ন টুকরোর পাশ দিয়ে ক্ষীণ জলধারা গড়িয়ে গেছ, মাছি থিকথিক করছিল। শরীরটার চামড়া ঢাকা হাড়গুলো ঈষৎ ওটানামা করছে। কমল দাঁড়িয়ে থাকল। অনেক নারী পুরুষ

দাঁড়িয়ে থাকল, তারা অপেক্ষারত বাস অথবা ট্রামের। কমল তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল, এই মুহূর্তে এটাই তার একমাত্র করণীয় বলে মনে হচ্ছিল। সে মনে মনে প্রত্যেকটি নারী পুরুষের জামা কাপড় খুলে নিল, শরীরের অতিরিক্ত মাংস মেদ রক্ত এবং ঔজ্জ্বল্য তুলে নিয়ে প্রত্যেকের কোমরে একটুকরো জীর্ণ ক্লেদাক্ত বস্ত্রাংশ জড়িয়ে দিলো এবং প্রত্যেককে ফুটপাথে শুইয়ে দিলো। তারপর সে বুঝি বহুযুগ অপেক্ষা করল ওগুলি ম্যমি হবার জন্য, তখন পরিত্যক্ত পৃথিবীতে কয়েকটি জীর্ণ কঙ্কাল মাত্র শায়িত।

হাঁটতে থাকল কমল।এখন সে একটি অত্যন্ত নির্জন রাস্তা পেয়ে গেল। অত্যন্ত পরিস্কার পথ, কালো চকচকে, দুপাশে উঁচু নীচু নানান ধাঁচের পাঁচিল ঘেরা নিঝুম সাজানো গোছানো বাড়ি সব উদ্যান পরিবেষ্টিত।একটি উদ্যানের ভিতর থেকে ঝুঁকে আসা একটি বিরাট গর্বিত গাছ হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। তার এলাকার সমস্ত পথ জুড়ে হলুদ ফুলের আচ্ছাদন। কমল খুব অস্বস্তি বোধ করছিল, সে পা দিয়ে ঘসে ঘসে কিছু ফুল রাস্তায় মাখিয়ে দিলো ও একটা পাঁচিলের পাশে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করল। হাঁটতে হাঁটতে নির্জন পথের শেষে সে একটা সেতু পেয়ে গেল। ছোট্ট সেতু নীচে পূণ্যস্রোতা আদিগঙ্গা প্রবাহিত বুঝতে পারল। সেতুর পাশে একটা বিরাট খাটাল, কয়েকটা মহিষ কাদায় গোবরে গা জুবড়ে বসে কিংবা শুয়ে। সমস্ত জায়গাটা কেমন কর্দমাক্ত বাতাসে উৎকট দুর্গন্ধ - কমল বেশ তৃপ্তি অনুভব করল। ওদিকে জলের ধার ঘেঁসে কয়েকটি শকুন বিভৎস ঘাড় আর ঠোঁট উঁচিয়ে নড়াচড়া করছিল, সেদিকে তাকিয়ে সে সহসা ভীত হয়ে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল। তারপর একসময় সে দেখল হাজরার মোড়ে পার্কের পাশে সে দাঁড়িয়ে। সে খুব ক্লান্তি অনুভব করছিল, মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখ বুজে সে রেলিংএ হেলান দিয়ে দাঁড়াল। সহসা তার মনে হলো, চারপাশে জলন্ত মশাল হাতে কারা ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিলো। কমল তাদের কারো মুখ দেখতে পারছিল না, শুধু কতগুলো হাত, কতগুলো মশাল ধরা মুঠো মুঠো হাত

সামনে দাঁড়ানো বিশাল এক গাছে আগুন ধরিয়ে দিলো, মাথার মধ্যে আগুনের উত্তাপ দপ্ দপ্ করছিল, চোখ ফেটে যাবে মনে হচ্ছিল। জলন্ত গাছ তার দিকে ঝুঁকে আসছিল। কমল আঙুল দিয়ে দুচোখের পাতায় চাপ দিলো, মনে হলো দুগালের ওপর রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। কমল হাত দিয়ে দেখতে চাইল, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না...

আগুন নিভে আসছিল। কে যেন কমলের হাত ধরে আলতো ঝাঁকুনি দিলো, চোখ খুলল কমল, দেখল সামনি একটি শিশু দাঁড়িয়ে, তার গায়ে বয়স্কের জামা, জামার ঝুল তার পায়ের পাতা ছুঁয়ে লটপট করছিল আর জামাটা যদিও হাফ্ হাতা তথাপি সেটা তার গোটা হাতটাই ঢেকে ফেলেছে। শিশু সেই হাত তুলে কমলের কাছে কি যেন চাইল, কমল তার বিবর্ণ চোখ শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল আনন্দ শৈশবের দেহ নিয়ে বার্দ্ধক্যের জামা গায়ে দিয়ে তার সামনে হাত পেতে কি যেন চাইছে। সে তীব্রস্বরে চিৎকার করে উঠল - কি চাই? নিজের কণ্ঠস্বরে সচকিত হয়ে দ্রুত হাঁটতে থাকল। কমল তার চারপাশে জনস্রোত ফেলে হাঁটছিল। কমল বাড়ি যাচ্ছিল। ঘরে ফিরল কমল। হাতে জট পাকানো সুতোর একটা লাটাই নিয়ে সে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অনেকক্ষণ ধরে অনেক চেষ্টা করেছে সে সুতোর জট খোলার জন্য - এরূপ একটা অনুভব তার মাথার মধ্যে ছিল, একটা হাবজিগাবজি ভাব যেন কিলবিল করছিল যার মধ্যে ঠিক কোনো চিন্তা সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল না। প্রায় বোধশক্তিহীন সচল মনুষ্য আকৃতি কোনো এক যন্ত্রের মতো সে ঘরে ফিরল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করল কমল। ঠান্ডা জলের প্রথম স্পর্শ যখন শরীরে তখন তার শরীর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সচকিত হয়ে উঠল। তার মনে হচ্ছিল কিছু যেন ভেসে নেমে যাচ্ছে তার ঘাড়ের পাশ দিয়ে, গড়িয়ে পড়ছে যেন বদ রক্তের মতো কিছু। সে আরাম বোধ করছিল। ফুলকাটা আসনে বসে পরিপাটি ভাবে ভাত খেল কমল। হঠাৎ পাতি লেবুর গন্ধ তার খুব ভাল

লাগছিল। খাওয়া শেষ করে জলপান করে সে পরিতৃপ্ত বোধ করল।

পাশের বাড়ির রেডিওতে একই কণ্ঠে পরপর রবীন্দ্রসংগীত বেজে চলেছে, বালিশে মাথা রেখে গভীর মনোযোগে গান শুনছিল কমল, একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

এক সুন্দর অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কমল। দুপাশে দীর্ঘদেহ গাছ সব সুন্দর। গাছেদের পাতারা বড় ব্যস্ত বাতাসের সাথে, কথা বলার শব্দ মর্মর, রৌদ্রের অজস্র টুকরো মুঠোমুঠো ছড়িয়ে চারপাশে অনাবিল হাসির মতো, তার বুকের মধ্যে ঢেউ উঠছিল, বড়ো ভাল লাগছিল কমলের....

বিকালে যখন ঘুম ভাঙল নিজেকে তার খুব হালকা মনে হচ্ছিল। কোনো গ্লানি নেই, কোথাও কোনো যন্ত্রণা নেই, তার বুকের মধ্যে গভীর প্রার্থনার মতো কিছু অনুরণিত হচ্ছিল। মুখ হাত ধুয়ে পাটভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী পরল সে, পরিপাটি মাথা আঁচড়াল ও রাস্তায় নামল।

বাঁশের একটি ফ্রেমের ওপর নতুন বস্ত্রখণ্ড জড়ানো আনন্দের দেহ শায়িত। কিছু ফুল সাজিয়ে দেওয়া হলো তার মাথার দুপাশে। আনন্দের চোখের পাতা ঈষৎ ফাঁক হয়ে আছে। অক্ষিগোলক সামান্য যেন চিকচিক করছিল। খুব ছোট লাগছিল আনন্দর দেহ - একটি কিশোরের দেহ যেন। দেখতে দেখতে একসময় কমলের বুক উথালপাথাল করে উঠল, আনন্দর দেহের পাশে হাঁটুমুড়ে বসল সে, তার দুগাল অশ্রুধারায় ভেসে যাচ্ছিল।

ইলেকট্রিক চুল্লীর মুখ খুলে গেছে, কমল দেখল এক গভীর আলোর রাজ্যে আনন্দ নিশ্চিন্তে চলে যাচ্ছে। চোখ বুজে কমল চিৎকার করে উঠল - ঈশ্বর, এক মুঠো রোদ্দুর দাও...বিশাল হলঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে থামের খিলানে খিলানে কমল আনন্দর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে শুনল - এক মুঠো রোদ্দুর না - আ -ও....

(রচনাকাল ১৯৭০)

পার্শ্বচরিত্রের নায়ক

(রচনাকাল ১৯৭৩)

শুধুমাত্র দেওয়াল ঘড়ি টিক্ টিক্ শব্দ করছিল। আর কোনো শব্দ নেই। নিঃশব্দ অফিস চেম্বারে সে দাঁড়িয়েছিল বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের এপারে। শেডল্যাম্পের আলোকে আলোকিত টেবিল। মিস্টার সেনের মুখ আলোর সীমানার ওপারে। টেবিলের ওপর খোলা ফাইলে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। দাঁতের ফাঁকে পাইপ, তা থেকে সূক্ষ্ম এক ধোঁয়ার রেখা উঠছিল পাকিয়ে পাকিয়ে, বাতাসে তামাকের গন্ধ। মাথার ওপর সিলিং ফ্যান মৃদু শব্দ করছিল। উত্তেজনায় তার বুক ধক্ ধক্ করছিল।

কয়েকটি মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে নিজেকে সম্বৃত করতে চাইল, তারপর -

- মিষ্টার সেন, আপনি অবিনাশবাবুকে খুব আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন - কণ্ঠস্বর দৃঢ় করে সে কথা বলতে চাইল, কিন্তু ঈষৎ কাঁপল যেন।

নিশঃব্দ চেম্বার। টিক্ টিক্ শব্দ শুধু। খস্ করে একটা কাগজ ওল্টানোর শব্দ হলো। আরও কয়েকটি মুহূর্ত।

- মিষ্টার সেন, আপনি অবিনাশবাবুকে -

- গো, এন্ড অয়েল ইয়োর ওন্ মেশিন। - শরীরের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙ্গী পরিবর্তন করল না, শুধুমাত্র কয়েকটি কথা চিবোনো পাইপের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এলো।

- আমার কথার উত্তর আমি পাইনি। - যদিও তার কানে ঝম্ ঝম্ শব্দ করছিল রক্তের উচ্ছাস তথাপি সে সংযত গলায় কথা বলল।

- এটা আপনার ব্যাপার নয়, সুতরাং -

- না হতে পারে, কিন্তু, আমাদের ব্যাপার, এটা আমাদের সকলের অপমানের ব্যাপার, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে।

- কার কাছে? আপনার কাছে নাকি?

- না, অবিনাশবাবুর কাছে।

- লিডার হবার চেষ্টা করছেন?

- আপনি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করলে আমিও অপমানকর কথা বলতে বাধ্য হবো।

- স্টপ ইট এন্ড গো - টেবিল চাপড়ে প্রায় গর্জন করে উঠলেন তিনি।

সে দাঁতে দাঁত চাপল, হাত মুঠো করল, দরজা খুলল, বেরিয়ে এলো।

বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপে সে বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়ে সরু পথগুলি পেরিয়ে চেয়ারে এসে বসল, ঘাড় ফিরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখল। সকলের চোখে জিজ্ঞাসু ভাব ছিল, কিন্তু কেউ তার কাছে উঠে আসছিল না কিংবা জিজ্ঞাসা করছিল না কি হলো। আবহাওয়া থমথমে।সে অবাক হচ্ছিল সকলের মুখে কেমন একটা ভীতু ভীতু ভাব। অবিনাশবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, তার কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন - আমার জন্য কতগুলি বাজে কথা শুনে এলেন তো? কেন গেলেন ভাই? সবই আমার কপাল, ওতে আমার কিছু যায় আসে না।

মুখ তুলে তাকাল সে। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ দেখল। মনে হয় ওনার শরীরে যথেষ্ট রক্ত নেই। গাল এবং গলার চামড়া জীর্ণ হয়ে কুঁচকে গিয়েছে। ওনার মুখের দিকে তাকালে কেমন মায়া হয়। অথচ ওই দাম্ভিক লোকটি কত অনায়াসে এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে কতগুলি বাজে কথা বলে হাতের ফাইল ছুঁড়ে টেবিলে ফেলে দিয়ে গেলেন। যেন ফাইল ছুঁড়ে মারতে চাইলেন। এসব দেখে তার তিরিশ বছর বয়সের রক্ত চন্ চন্ করে উঠেছিল।

- কপাল দেখাবেন না অবিনাশবাবু - সে প্রায় গর্জন করে উঠল - এটা মেনে

নিলে এরপর উনি আমাদের সকলকে এভাবে দাবাবেন। আগে যে সেকশনে ছিলেন সেখানে ওনার অনেক বদনাম আছে। এখানে এসে প্রথমেই আমাদের ওপর শাসন চালাতে চাইছেন, এটা মেনে নেওয়া যায়না।

অবিনাশবাবু ঘাড় ঝুঁকিয়ে কথাগুলি শুনলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। আস্তে আস্তে হেঁটে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি কেমন দুর্বল। সে তার চারপাশে তাকিয়ে দেখল, দেখল অনেক অবিনাশবাবু যেন বসে।এক অবিনাশবাবু যেন অনেক হয়ে গিয়েছেন। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ, গায়ে যথেষ্ট রক্ত নেই, গাল এবং গলার চামড়া জীর্ণ হয়ে কুঁচকে গিয়েছে। তাঁরা বছরের পর বছর শান্ত শিষ্ট রক্তধারা শরীরে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন আক্ষেপে আ-ক্ষে-পে। সে তার সামনে রূঢ় ভবিষ্যৎ দেখতে পেল। সে এক বিশাল কৃষ্ণগহ্বর দেখল যেন। তার বুকের মধ্যে ধ্বক করে উঠল। তার মা কিছদিন ধরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বিয়ে দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, বিয়েটা তার করা দরকার একথা সে বোঝে। কি এক পদধ্বনি মাঝে মাঝে ভীষণ ভাবে দেহমনে নাড়া দিয়ে যায়। একটা ব্যাকুলতা বুক আকুল করে। কিন্তু তারপর? স্ত্রী সন্তান ভবিষ্যৎ? সন্তানের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই, স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট খাবার নেই, নিজের জন্য যথেষ্ট খাবার নেই। অভাব অপুষ্টি অসুস্থতা এবং ভবিষ্যৎ - সন্তানের ভবিষ্যৎ - হাতে তার মাসান্তে গোনা কড়ি। তার সাধ্য কতটুকু সন্তানের সুষ্ঠু শিক্ষার জন্য ব্যয়? তার সাধ্য কতটুকু সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যয়? তার মনে হলো দৃষ্টি কেমন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। সে চারপাশে তাকিয়ে দেখল সবাই ভীষণ মনোযোগ দিয়ে কাজে ব্যস্ত। যেন একটা দাম্ভিক কণ্ঠস্বর তাদের পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। একটু তাকালেই গর্জে উঠবে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। পৃথিবী নিথর। তার মনে হলো নিথর পর্বতশ্রেণীর মধ্যে তারা ফসিল হয়ে আছে।

সহসা একটা চেয়ার টানার শব্দ হলো, সে একটু প্রকৃতিস্থ হলো, দেখল সতীশবাবুর টেবিলের সামনে বেয়ারা দাঁড়িয়ে আছে। সতীশবাবু চেয়ার

ছেড়ে উঠেছেন, বেয়ারার পিছুপিছু এগিয়ে চললেন। কোনো দিকে তিনি চোখ ফেরাচ্ছিলেন না, সোজা চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন। সকলের মুখ তার অপসৃয়মান শরীরের দিকে ফিরেছিল, এখন যে যার ঘাড় ফেরাল।সে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল। তাদের মনের ভাব সে যেন পড়তে পারছিল। তারা প্রত্যেকেই ভাবছিল - তাকে কেন ডাকল না। তারা প্রত্যেকে ওই ঘরে ঢুকে মন রাখা কথা বলার জন্য আকুল হচ্ছিল। আহা! সতীশবাবু যেন কি এক মূল্যবান রত্ন ওই ঘরে গিয়ে পেয়ে যাবেন ও সকলকে বঞ্চিত করবেন। সে তার চারপাশে অনেক সতীশবাবুকে বসে থাকতে দেখল যাদের মুখের ভিতর একটা হ্যাংলা জিহ্বা লক্ লক্ করছিল।

- দেখলে, দেখলে, ব্যাটা ঠিক চুকলি করতে গেল - তার দিকে মুখটা একটু এগিয়ে ফিসফিস করে বললেন বিমলবাবু। সে ম্লান হাসল, সতীশবাবুই বা সারাজীবন তাঁর সাহেবদের কাছে চুকলি করে কি পেয়েছেন? পিঠোপিঠি দুই মেয়ের বড়টার বিয়ে দিয়েছেন যেখান থেকে যতটুকু সম্ভব ধার করে। তারপর? পরেরটির জন্য কি ব্যবস্থা করবেন? দুপুরে সতীশবাবু টিফিন বাক্স খুলে অল্প একটু তরকারি দিয়ে রুটি খান। তখন তিনি তাঁর দুঃখের কথা বলেন। সে কথাগুলিতে কোনো ভেজাল নেই। চকচকে টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন - দেখ্ ভাই, একফোঁটা ঘি মাখানো না হলে আমার গলা দিয়ে রুটি নামেনা, মাসে মাত্র আড়াইশো গ্রাম কিনতাম, তা উঠতে উঠতে কুড়ি টাকায়, তা পাঁচ টাকা খরচ করার সাধ্য কি আছে? এ মাসে ওটা বাদ দিয়ে দিলাম, সারা জীবনের অভ্যাস -

তার ভাবতে অবাক লাগে সেকশনের প্রত্যেকে কেন তাকেই দুঃখের কথা শোনায়।সে তো একজন সাধারণ মানুষ। কথায় কথায় গরম গরম লেকচারও দেয় না। বস্তুতঃ সে ভাল করে সাজিয়ে দুচারটে কথাও বলতে পারেনা। তবে? সতীশবাবু তাকে চুপিচুপি বলেন - দেখনা ভাই, উদার মনের কোনো বন্ধুটন্ধু নেই তোর? ব্রাহ্মনের ছেলে? মেয়েটা আমার খুব লক্ষী রে!

মাঝে মাঝে মেয়েটার ওপর আমার খুব রাগ হয় জানিস - সতীশবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে রাগের কথা বলেন - যদি একটা প্রেম-ট্রেম করেও নিজের ব্যবস্থা করে নিত আমি তাকে বুক ভরে আশীর্বাদ করতাম। কিন্তু মেয়েটা বড় লক্ষী কিনা! তাই দুর্নামের ভাগী হবে না। আঃ, দুর্নাম দুর্নাম! লোকের কথায় কি আসে যায়? লোক কি আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে?

এই সতীশবাবু সাহেবের ঘরে গিয়ে কি বলবেন? প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ নেই। তবে সতীশবাবুর এরকম বদনাম আছে তিনি না কি সেকশনের কথাবার্তা সাহেবের কানে তুলে থাকেন। কিন্তু পরিবর্তে তিনি কি পান? তা অন্ততঃ অবিনাশবাবুর মতো এরকম বাজে কথাটথা শুনতে হয়না - এটুকুই লাভ কি? সতীশবাবু ও অবিনাশবাবু দুজনেই তো এখানে প্রায় পঁচিশ বছর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক হয়েই কাটিয়ে দিলেন। তাঁদের সামান্য প্রমোশনটুকুও হয়নি।

হঠাৎ তার মনে হলো অবিনাশবাবুর ছেলের কথা, সে আজ পনেরো দিন হলো হাসপাতালে আছে, তার পেটে আলসার হয়েছে, অজস্র রক্তক্ষরণ, অনেক রক্ত দিতে হয়েছে তাকে। দু'দিন একটু ভালোর দিকে ছিল, কিন্তু গতকাল অবিনাশবাবু অফিসে আসেননি, তবে কি আবার -

- অবিনাশবাবু, আপনার ছেলে কেমন আছে? - সে জিজ্ঞাসা করল।

- ভালো না, - কপালে আঙুল ঠুকে বললেন - গতকাল আবার রক্ত দিতে হয়েছে, আবারও হয়ত দিতে হবে, কিন্তু আমি একেবারে নিঃসম্বল হয়ে গেছি, সব যেন কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

....রক্ত....আরো রক্ত....মানে আরো টাকা....সন্তান ....স্নেহের সন্তান.... তার অসুস্থতার জন্য ব্যয়ের সামর্থ কতটুকু? এইটুকু?....মায়ের ইচ্ছা আমার বিবাহ, খুব সদিচ্ছা। আমারও রক্তের মধ্যে মাঝে মাঝে বেজে ওঠে পদধ্বনি.... রক্তে জোয়ার আসে, কি যেন আকুলতা... আমার স্ত্রী, সন্তান এবং সংসার! কিন্তু তাদের সুখ? তাদের ভবিষ্যৎ? আর আমার দুই বোন –

তাদের বিবাহ? তাদের সুখ? কিন্তু টাকা? আমার সামর্থ? না কি সতীশবাবু যে কথাটা মেয়েকে বলতে পারেননি সে কথা বোনেদের বলে দেবো? তার মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করছিল। সমস্ত শরীরে উত্তাপ, সে উঠল, বেসিনে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিলো।

অবিনাশবাবুর এই ব্যাপারটার একটা সম্মানজনক ফয়সালা হওয়া দরকার। হয়ত তাঁর ছেলের অসুস্থতার জন্য মন বিক্ষিপ্ত। কুবই স্বাভাবিক, আর সেজন্য তাঁর ফাইলে কিছু ভুলভ্রান্তি হতেই পারে। আর একথা উনি জানেন না তাও নয়। অবিনাশবাবু কয়েকদিন এলোমেলো ছুটি নিয়েছেন, কোনো কোনো দিন ছুটির অনেক আগেই বেরিয়ে গেছেন, ওনাকে বলেই গেছেন। অথচ সবকিছু জানা সত্বেও এই বিশ্রী ব্যবহার - এর একটা বিহিত হওয়া দরকার, না হলে ওনার উগ্রতা আরো বাড়বে, যা খুশী তাই বলার সাহস বাড়বে। সে মনস্থির করে ফেলল ব্যাপারটা গুছিয়ে লিখে ওপর মহলে একটা আপিল করতে হবে, তার জন্য চাই অবিনাশবাবুর মনের দৃঢ়তা, কারণ আপিলটা তিনিই করবেন। সে অবিনাশবাবুকে ডাকল, বলল, - অবিনাশবাবু, ছুটির পর আমরা একসঙ্গে হাওড়া পর্যন্ত যাবো, আপনি আপনার ট্রেনে উঠবেন, আমি আমার বাসে।

সতীশবাবু টিফিন খাচ্ছিলেন। তাঁর চোয়ালের হাড় দুটো ওঠানামা করছে। মাঝে মাঝে দাঁতে জড়ানো রুটি জিভ দিয় চুষে নিচ্ছেন। এবম্বিধ ক্রিয়াকলাপ সে তাকিয়ে দেখছিল। নানান মানুষ নানান ভঙ্গিতে খাওয়া দাওয়া করে। কিন্তু এই খাওয়া কাজটারও শ্লীল অশ্লীলতা আছে - কথাটা মনে হলো তার। সতীশবাবুর খাওয়ার ভঙ্গীটা তার বড় অশ্লীল লাগছিল। কেমন জান্তব ভাব। খাওয়া - ' ইট্ ইজ্ এ্যান এসেনশিয়াল পার্ট অফ্ লাইফ্'। এই অংশটি যদি জীবন থেকে বাদ দেওয়া যেত! অথচ খাওয়াই জীবন! সতীশবাবু, আপনি একটু শোভনীয় ভাবে - সে প্রায় বলেই ফেলেছিল আর কি! কি অন্যায়! সে উঠে এসে সতীশবাবুর সামনের চেয়ারে বসল,

সাহেব আপনাকে কি বলল?

সতীশবাবু কেমন থতমত খেয়ে তাকালেন, বললেন, - তোকে মিথ্যে বলবনা, জিজ্ঞেস করছিলেন তুই কোন পার্টির মেম্বার, তা আমি বললাম, ও তো কোনো পার্টিফার্টি করে না। তুই আমাকে বিশ্বাস করতে পারিস। তবে তুই যেন আবার এই নিয়ে তর্ক করিস না, তাহলে আমার অবস্থা - একটা ঢোক গিললেন। বেয়ারা এসে দাঁড়াল, বলল - সাহেব আপনাকে ডাকছেন।

আবার ছায়াছায়া ঘর - টেবিল ল্যাম্প - আলোয় ভাসা টেবিল - আলোর সীমানার ওপারে মুখ।

- হ্যাঁ, গত সপ্তাহে হরতালের দিন আপনি আসেননি, ওপর থেকে আপনার ছুটির দরখাস্তের ওপর একটা নোট দিতে বলেছে।

- আমি তো লিখেছি কেন আসতে পারিনি।

- পড়েছি, অসুস্থতা।

- হ্যাঁ, আমার ক্রনিক এ্যামিবায়োসিস আছে, মাঝে মাঝে ওটা ট্রাবল দেয়।

- দুর্ভাগ্যবশতঃ সেটা হরতালের দিনই হলো। যাই হোক, মেডিকেল সার্টিফিকেট দেননি কেন?

- মেডিকেল সার্টিফিকেট? - সে যেন ব্যঙ্গ করে হাসল - অত অল্প অসুখে আমাদের ডাক্তারের কাছে যাবার পয়সা নেই। নিজেই দরকার মতো দু'চারটে ট্যাবলেট কিনে আনি, সেরে যায়।

- না, ওটা থাকলে আমি ঝামেলা এড়াতে পারতাম।

- আপনি যা খুশি লিখতে পারেন।

- আপনি কি কোনো পার্টির সঙ্গে জড়িত?

- আপনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে চলে যাচ্ছেন।

- আমি বলতে চাই আপনার হরতালে সমর্থন ছিল, এবং সেজন্যই অফিসে আসেননি। - ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে বলতে পারি - হ্যাঁ,কারণ হরতাল

ডাকা হয়েছিল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে। মাইনের টাকায় আমার পরিবারের সকলের কোন রকম খাওয়া দাওয়া জোটানো আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমি আমার অনুপস্থিতির কারণ লিখেই জানিয়েছি।

- আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

রক্ত বড় দ্রুত সঞ্চালিত হচ্ছিল ধমনীতে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ শব্দ। মাঝে মাঝে কি যে হয়, কোথা থেকে যত তপ্ত বাতাস ছুটে আসে, শরীরে জ্বালা ধরে যায়, রক্ত দাপিয়ে বেড়ায় শিরায় শিরায়।....আমি পৃথিবীর এক অসুস্থ সময়ে জন্মগ্রহন করেছি....আমি এক অসুস্থ সময়ের গর্ভে লালিত হচ্ছি...

দূর পাল্লার কোনো ট্রেনে সে কখনো ওঠেনি। সত্যি কথা বলতে কি এই তিরিশ বছর বয়সের জীবনে খুব মনে করে দেখলে সে তিন চার বারের বেশী ট্রেনে ওঠার কথা মনে করতে পারে না, তাও লোকাল ট্রেন।

হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি শহরতলীর যেখানে সে থাকে সেখান থেকে তার সীমাবদ্ধ জীবনের কাজের গণ্ডীগুলি বাস ট্রামের আওতায় পড়ে। তার মনে পড়ে ছোটবেলায় সে প্রথম ট্রেনে উঠেছিল পুটু মাসীর বিয়ের সময়, বরযাত্রীদের সাথে। সে দিনের উত্তেজনার কথা আজও মনে পড়লে সে অনুভব করতে পারে। তখন বোধহয় সে ক্লাস ফাইভে-টাইবে পড়ে। বাবার হাত ধরে আরও অনেক সাজগোজ করা ফুলবাবু মানুষের সাথে সে এই হাওড়া স্টেশনে এসে ট্রেনে উঠেছিল। তখনো ইলেকট্রিক ট্রেন হয়নি। স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়া - হুস্ হুস্ শব্দ প্লাটফর্মের শেডে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত.... এই সব ভাবতে ভাবতে সে হাওড়া স্টেশনের বিশাল শেডের নীচে অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়িয়েছিল।

অবিনাশবাবুকে নিয়ে ট্রেনটা চলে গেছে। হাজার হাজার ব্যস্ত মানুষদের আনাগোনার মাঝে সে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। কিছুটা বা এলোমেলো। এদিক ওদিক চাইছিল, অথচ কিছুই দেখছিল না। তাকে খুব ক্লান্ত বিষন্ন ও

ম্রিয়মান দেখাচ্ছিল।

কখনো কখনো সে এই বিশাল স্টেশনে বেড়াতে আসে। এক একদিন কি যে হয়! মন জুড়ে এক গভীর বেদনাবোধ সারাক্ষণ উথলে ওঠে। এক বিশাল শূন্যতা চারপাশ থেকে ঘিরে আসে। কোথাও যেন পালাতে ইচ্ছা হয়। তখন সে এখানে এসে দাঁড়ায়। যেন কোনো বিশাল বিস্ময়কর প্রাণবন্ত জগতের দুয়ারের চৌকাঠে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে চায়...। ঘোষকের কণ্ঠস্বর গম্ গম্ করে আহ্বানে।ব্যস্ত মানুষদের ছুটোছুটি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি - মনে হয় কি যেন ঐশ্বর্য পাওয়া একরাশ মানুষ। প্লটফর্ম জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল ট্রেন কেমন গম্ভীর! ছুঁয়ে দেখলে কোন সুদূরের সঙ্কেত জ্বলজ্বল করে ওঠে। সে বড় তৃপ্তি পায়। আস্তে আস্তে মনটা ভাল হয়ে ওঠে। কেন তা সে জানেনা।

এমনিতে সে বেশ শক্ত মনের মানুষ। তিনশ টাকা মাইনের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী, নিজের সামর্থ সংগতি ও মান সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। বিধবা মা তিন ভাই বোন আর সে - এই পাঁচ জনের খাওয়া দাওয়া পোষাক-আসাক চিকিৎসা লেখাপড়া লোকলৌকিকতা। বাবা তবু মাথা গোঁজবার মতো বাসস্থান দিয়ে গেছেন। তাকে খুব হিসেবে করে চলতে হয়। সে জানে এর বেশি কোনদিনই এগোতে পারবেনা সে। তাই তার দৈনন্দিন জীবন খুবই সাদামাটা মন্থর গতিতে চলে - ঠেলে গুঁজে ঠোক্কর খেতে খেতে মাথা নীচু করে। কিন্তু তবু - তবু মাঝে মাঝে এমন এক একটা ঘটনা সামনে এসে দাঁড়ায় - সব এলোমেলো হয়ে যায়। কে যেন তাকে যাদুকরের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলে - দেখ তুমি কত হীন, কত ছোট। তখন মাথার মধ্যে আগুন, মনের মধ্যে পাথুরে অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। বুকের মধ্যে ধাক্কা দেয়.... তারপর একসময় থিতিয়ে এলে গভীর অবসাদ... এক গভীর শূণ্যতা ঘিরে আসে অন্ধকার প্রান্তরের মতো....

তীব্র হুইসল্ দিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকছিল একটা ট্রেন। অন্যমনস্ক সে চমকে

উঠল। ঘড়ি দেখল - ছটা বাজে। দুটো থেকে ছটা - কয় ঘন্টা? - সে নিজেকে জিজ্ঞেস করল - চার ঘন্টা - নিজেই উত্তর দিল। মাত্র এই চার ঘন্টাতেই আমার রক্ত কত শান্ত হয়ে এসেছে - মনে মনে বলল - আমার রক্ত বড় কমজোরি - ভাবতে ভাবতে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। আজ দুপুরে বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে, চারিদিকে প্যাচপেচে জল কাদা। গিসগিস করছে লোকজন। বিশৃঙ্খল এক মিছিল যেন। কাতারে কাতারে মানুষ যাচ্ছে আসছে, আসছে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে মানুষ জন্মাচ্ছে - ধুঁকছে-মরছে-জন্মাচ্ছে। সে দাঁড়াল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সে বিশৃঙ্খল মানুষের মিছিল দেখছিল।অথচ জনতা অনেক কিছুই পারে।

সামনে একটা পত্রিকার স্টল, মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক টুক করে কি যেন একটা বই ব্যাগে পুরে ফেললেন, তারপর মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করলেন। সে দোকানের বইগুলি দেখছিল, সারি সারি সাজানো উত্তেজক ফটোর অজস্র যৌন আকর্ষক পত্রিকা দুলছিল।

এক বিষাক্ত গন্ধে বাতাস কলুষিত হয়ে আছে। তার শরীর কেমন জ্বর জ্বর লাগছিল। জিভটা শুকনো। তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খেলে ভাল হতো। ক্লান্ত বিষন্ন সে একটা উপছে পড়া ভীড় বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে পড়ল।

ঝুলতে ঝুলতে একসময় সে কেমন করে একধাপ ওপরে চলে এলো। ভাদ্রমাসের গুমোট। চাপচাপ লোকজন। ঘামের গন্ধ। এমনিতেই তার মাথা ভার হয়েছিল, এখন কপালের দুপাশে দুটো শিরা যেন ছিঁড়ে যেতে চাইছিল। লেডিস সীটের সামনে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের নরম পেটের অনেকটা অংশ দেখা যাচ্ছিল এবং উদ্ধত বুকের পাশ। তাদের গায়ের ওপর কয়েকজন লেপটে ছিল। মেয়ে দুটি দুএকবার ঘাড় ফিরিয়ে ঈষৎ কপাল কুঁচকে শাসন করতে চাইল না কি? সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। অথচ ওদের শাড়ি বারবার সরে যাচ্ছিল, ওরা পুণরায় ঢাকা দিচ্ছিল। লেপটে পড়া

লোকগুলি এবং তাদের পিছনে আরও যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাও লোভীর মতো - দেখতে দেখতে তার হাসি আসছিল। আঃ, কে যেন তার পা মাড়িয়ে দিলো - শুয়োরের বাচ্ছা - সে মনে মনে বলল। কন্ডাকটর তার নাকের কাছে ফর্ ফর্ করে টিকিটের বাণ্ডিলটা বাজিয়ে দিয়ে বলল - টিকিট টিকিট।

পরদিন অফিসে আসতে তার একটু দেরী হয়ে গেল। দেরীতে অফিসে আসায় সে অভ্যস্ত নয়। তার নিজের এটা ভাল লাগে না। কিন্তু আজ রেশন আনতে হয়েছে তবে ভাত হয়েছে।প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু চাল তাকে বাজার থেকে কিনতে হয়, রেশনের চালে কুলোয় না। কিন্তু মাসের শেষে তার পকেটে টাকা এতো তলানিতে এসে পৌঁছেছে যে চাল কিনতে গেলে রেশন তোলা যাবে না।

টেবিলে এসে সে অবিনাশবাবুকে ডাকল। পকেট থেকে আপীলের খসড়াটা বার করল। কাল রাতে অনেক কাটাকুটি করে বেশ কড়া ভাষায় সে এটা লিখেছে। অবিনাশবাবু কাছে এসে দাঁড়ালে সে কাগজটি ওনার হাতে তুলে দিলো, বলল - এটা টাইপ করে সই করে দিয়ে আসুন। অবিনাশবাবু চুপচাপ তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর কিছুটা সঙ্কুচিত ভাবে বললেন - ওটা আর দরকার হবে না, আমি সাহেবের ঘরে গিয়েছিলাম, একটা মিটমাট হয়ে গেছে।

- মানে? উনি আপনাকে ডেকে ক্ষমা চেয়েছেন?

- না ঠিক তা নয়, তবে কি জানেন, আমরা সামান্য মানুষ, কি হবে ওদের সঙ্গে ধ্বস্তাধস্তি করে। শেষে একটা কিছু - ঢোক গিললেন অবিনাশবাবু - তাই আমি ওনার কাছে গিয়েছিলাম, বললাম - জানেন তো, ছেলেটার অসুখ, আমার মাথায় মধ্যে দুশ্চিন্তা, তাই ভুল কিছু হয়ে গেছে। উনি বললেন ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি আসুন।

তার মাথার মধ্যে রক্ত লাফিয়ে উঠল, তড়িৎ

প্রবাহে সমস্ত শরীর টানটান হয়ে গেল যেন, সে মুঠো করে হাত তুলল, প্রচণ্ড জোরে এক ঘুসি মারল অবিনাশবাবুর চোয়ালে। অবিনাশবাবু কি যেন বলতে চাইলেন, তাঁর হলদেটে ম্লান চোখ বিস্ফারিত হলো, টেবিলের কোন আঁকড়ে কোনক্রমে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তাঁর কষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ল।

সে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে এলো, তারপর দ্রুত হাঁটতে থাকল। কোথায় যাচ্ছিল সে জানে না, সে পথ হাঁটছিল।

.... আমি জানি, অবিনাশবাবু, এ আপীলের খুব একটা মূল্য নেই - সে যেন অবিনাশবাবুকে সামনে রেখে তর্ক করছিল - আমি জানি, আপনার এই আপীল আজকের এই দুস্থ সময়কে এতটুকু টলাতে পারবে না। যারা শোষক তারা থাকে অনেক দূরে, আমাদের নাগালের বাইরে। তারা কিছু কিছু সুখ সুবিধা আর স্বচ্ছলতা দিয়ে নিয়োগ করে রেখেছে এই সব দ্বাররক্ষী যক্ষ। এই যক্ষেরা আমাদের শাসন করবে, দাবিয়ে রাখবে যাতে আমরা মাথা তুলতে না পারি। কিন্তু আর কিছু না হোক সামান্য আত্মমর্যাদাটুকু তো আমরা বাঁচাতে পারি? সেটুকুও আপনি বিসর্জন দিলেন?

মোটামুটি প্রকৃতিস্থ হলে সে দেখল হাওড়া ব্রীজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে সে অনেকটা পথ চলে এসেছে। ব্রীজের মাঝামাঝি এসে সে রেলিংএ ভর দিয়ে দাঁড়াল। সামনে আকাশ, মুক্ত নীল আকাশ, নিচের দিকে তাকিয়ে জলস্রোত দেখল সে। দূরে যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি প্রসারিত করল। শরতের ভরা নদী, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত দুএকটি নৌকা, বোট স্টীমার। সারাক্ষণ একটা ঝমঝম শব্দ বাজছিল কানের দুপাশে। তার বুকের মধ্যে একটা কান্না ঠেলে উঠছিল। গলার কাছে আটকে আছে দলাপাকানো কি যেন। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। হাত দিয়ে চোখ মুছল সে, ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে থাকল। সারাটা দিন সে কাটাল উদভ্রান্তের মতো। সারাটাদিন কাটাল পথে পথে। সন্ধ্যায় সে যখন ঘরে ফিরল তখন

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সে ঘরে এলো। সারা শরীরে উত্তাপ, আর মাথার মধ্যে হিজিবিজি শব্দশঙ্কুল অরণ্য যেন। ভিজে জামাকাপড়ে সে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে রইল। এক গভীর অন্ধকার গহ্বরে সে যেন নিক্ষিপ্ত এইরকম একটা ভাব তার মনের মধ্যে। এরপর কি? এরপর? এরপর আমার চাকরি নিশ্চয় থাকবে না। এরকম একটা সুযোগ তারা নিশ্চয় হাতছাড়া করবে না। তারপর? আমি? আমার সংসার? সে ভালভাবে কিছুই ভাবতে পারছিল না। তার চোখের ওপর শীর্ণকায় ভিক্ষুকেরা, সেই পচা মাছ পুড়িয়ে খাওয়া পরিবারের দৃশ্য ভাসছিল। আমি ভিক্ষুক হয়ে গেলাম - সে বিড়বিড় করছিল - হায় ভগবান, আমি একেবারে ভিখিরি হয়ে গেলাম....

ট্রেন ছুটছিল। সে জানালার ধারে বসেছিল। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল তারে তারে, সট্ সট্ করে ছুটে যাচ্ছিল পোষ্টগুলি। সবুজ বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের স্তূপগুলি আপন মনে ঘুরছিল আর ঘুরছিল। হু হু করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাতাস, খুব ভাল লাগছিল তার। খুব সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, হাওড়া স্টেশন,আর এখন হলদে-সবুজ রঙের ইলেকট্রিক ট্রেন যেন পূর্ণ আত্মবিশ্বাসে তাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। সে অবিনাশবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল।

আজ রবিবার। তিনদিন সে বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয়নি। তিনদিন তিনরাত সে ভাল করে খায়নি ঘুমায়নি। সারাক্ষণ তার বুকে কি যেন এক ব্যথা মোচড় দিয়েছে, আর দুটি হলুদ বিষন্ন চোখ - আঃ - সারাক্ষণ তার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে, তাকে জর্জরিত করেছে। আর সেই গভীর অন্ধকার গহ্বর - হায় ভগবান, আমি একেবারে ভিখিরি হয়ে গেলাম। আজ খুব ভোরে উঠে সে স্নান করল। তিন দিনের গভীর ক্লান্তি ধুয়ে ফেলতে চাইল যেন। তারপর চুপিচুপি বেরিয়ে পড়ল।.... একটা ক্ষমা.... তার

কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা দরকার....

এখন সে অনেক শান্ত, বহুদূরে নীল আকাশে সাদা মেঘের মতো শান্ত সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যাচ্ছিল।

তারপর - পলেস্তারা খসা এক জীর্ণ বাড়ি। গাছগাছালি, ঝোপঝাড় - একটা বাচ্ছা ছেলে তাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলো।

চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় সে ডাকল - অবিনাশবাবু -

হলুদ বিবর্ণ চোখ, আলগা গায়ে অবিনাশবাবুকে আরও শীর্ণ লাগছিল। সে কিছুক্ষণ চুপচাপ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর নীচু হয়ে তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। অবিনাশবাবু ত্রস্তে পিছিয়ে গেলেন। সে বলল - অবিনাশবাবু, যে অপরাধ আমি করেছি - আমাকে আপনার পায়ে হাত রাখতে দিন।

- কিন্তু আমাকে প্রণাম নিতে নেই, আমার অশৌচ -

সে চমকে উঠল।

- গতকাল আমার ছেলে মারা গেছে - আবার রক্তক্ষরণ - আর হ্যাঁ, ওরা আপনার জন্য ডিসমিসাল চার্জশিট তৈরি করেছিল, আমাকে সাক্ষী - আমি বলেছি আমি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলাম, টেবিলের কোনা লেগে -

কে যেন কাঁদছিল। জীর্ণ দেওয়ালগুলির ফাঁক দিয়ে কান্না চুইয়ে পড়ছিল।.... বড় অসুস্থ সময়... আমি লালিত পালিত হচ্ছি এক অসুস্থ সময়ের গর্ভে... তবু দেবতার মতো কিছু মানুষের জন্য এগিয়ে চলেছে সময়...

(রচনাকাল ১৯৭৩)

বান্ধব

দেবদারুর একটা শুকনো পাতা জানলা দিয়ে এসে পড়েছে টেবিলে। কয়েকদিন ধরেই পাতা ঝরাচ্ছে দেবদারু গাছটি, আজই প্রথম এসে পড়ল ঘরে তিনি সাদরে পাতাটি তুলে নিলেন, রেখে দিলেন একপাশে। ফাল্গুন মাস, আজ ক তারিখ? ক্যালেন্ডারের কাছে গিয়ে দেখলেন - পাঁচ তারিখ। খোলা জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে বেশ। এটা দক্ষিণের জানালা। জানালা দিয়ে একটু তাকিয়ে দেখলেন দেবদারুকে, মৃদুস্বরে বললেন - ধন্যবাদ বন্ধু - হাত নাড়লেন।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটু জায়গা রেখে বাড়ি করেছিলেন বাবা, দখিনা বাতাসের জন্য। বাড়ি হওয়া থেকেই তিনি এই ঘরে। এই জানালা,জানালার ধারে এই টেবিল, এই চেয়ার তাঁর বড় প্রিয়। অনেক পরে ছেলেদের সহযোগিতায় যদিও বাবার করা একতলা বাড়ি দোতলা করেছেন তবুও একতলার এই ঘর ছেড়ে নড়েননি। শুধু সামান্য পরিবর্তন - বয়সকালে এই ঘর সংলগ্ন একটি বাথরুম করেছেন সুবিধার্থে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দেবদারুর দিকে - কিছু কিছু নতুন চিকন পাতা ফুটেছে গাছটির শরীরে। সকালের নবীন রোদ্দুর মেখে আছে পাতায় পাতায়। কয়েকদিনের মধ্যেই গাছটি ঝলমলিয়ে উঠবে নবযৌবনে।

গাছেরা পারে, একমাত্র গাছেরাই পারে বছর ঘুরে সেজে উঠতে নবযৌবনে, পৃথিবীর আর কোনো প্রাণ নয় - মৃদুস্বরে আবৃত্তির মতো বললেন তিনি, মাথা নাড়লেন, - ক্রমশ জীর্ণ হতে হতে আমি আশিতে, শতায়ু অনেক দূর, অত পথ যায় বা কজন! স্বগতোক্তি করতে করতে স্নানঘরের উদ্দেশ্যে।

স্নান শেষে নিজেকে গুছিয়ে বসলেন চেয়ারে, দেবদারু পাতাটি হাতে নিলেন, কলম খুলে পাতাটির গায়ে গোটা গোটা অক্ষরে সযত্নে লিখলেন –

৫ই ফাল্গুন ১৪১৭ বিংশতি বর্ষ। টেবিলের নীচের ড্রয়ার থেকে একটা পুরনো ডায়েরি বার করলেন, সাবধানে পাতা ওল্টালেন, প্রতিটি পাতার ফাঁকে রাখা আছে একটি করে দেবদারু পাতা, তাতে লেখা ফাল্গুনের তারিখ ও সাল। ডায়েরি খুলে দেবদারু পাতাটি রাখলেন, সাবধানে বন্ধ করলেন।

আবার অপেক্ষা, একটি বছর,হয়তো বা নয়! - ভাবলেন। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। ষাট বছর বয়সে তিনি যখন চাকুরি থেকে অবসর পেলেন সেই সময়ের কথা। তখন মাস দেড়েক হয়ে গেছে, সকালে কোনো ব্যস্ততা থাকেনা, এই চেয়ারে বসে থাকেন, একদিন এক ঝলক বাতাসের সাথে টেবিলে এসে পড়ল একটি আধ শুকনো পাতা। আনমনে পাতাটি হাতে নিয়ে তিনি উল্টেপাল্টে দেখলেন, তারপর কলম নিয়ে তারিখ লিখতে গিয়ে ক্যালেন্ডারে ইংরেজির নীচে দেখলেন বাংলা তারিখ ১ ফাল্গুন - চমকিত হলেন, - বাঃ! নববসন্তের শুরুর দিন! আমার অবসরের প্রথম বর্ষ!

টেবিলে রাখা ছিল একটি আনকোরা ডায়েরী ও একটি দামি কলম রিটায়ারমেন্টের সম্বর্ধনায় সহকর্মীদের দেওয়া। একটি শালও দিয়েছিল, জানুয়ারির প্রথম দিন থেকেই শালটি ব্যবহার করছিলেন তিনি। কলম খোলা হয়নি, সেদিনই প্রথম খুলেছিলেন ও দেবদারু পাতার গায়ে লিখেছিলেন - ১লা ফাল্গুন ১৩৯৮ প্রথম বর্ষ। ডায়েরি খুলে পাতাটি রেখেছিলেন, দেবদারুর দিকে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলেছিলেন - শুরু হলো জীবনে পাতা ঝরার কাল, একথা কি মনে করিয়ে দিলে বন্ধু?

সেই থেকেই চলছে। প্রতি বছর পাতা ঝরা শুরু হলে প্রথম যেদিন পাতা এসে পড়ে টেবিলে সেদিনই তিনি লেখেন ও ডায়েরী বার করে পাতাটি রেখে তুলে রাখেন। ডায়েরিতে আর কিছু লেখা নেই।

- গুড মর্নিং দাদু - দরজায় দাঁড়িয়ে বলল ছ'বছরের নাতি। স্কুলে যাবার সময় সে রোজই গুড মর্নিং করে। শুনে তার মন বড়ো ভাল হয়ে যায়।

- গুড মর্নিং - হাসিমুখে বললেন তিনি।

- ড্রয়ারে কি যেন লুকিয়ে রাখলে? - কৌতুহলী চোখ তার।

- কই নাতো!

- বা রে, রাখলে দেখলাম?

- ওটা একটা ডায়েরি -

ওই শুরু হলো বকবকানি, চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে - পিছন থেকে ডাকল ওর মা, হাত ধরে বেরিয়ে গেল।

এই নাতি তার ছোট ছেলের কনিষ্ঠ সন্তান। বড়ো বুদ্ধিদীপ্ত চোখমুখ। তিনি নাম রেখেছেন চিকন। বড়ো প্রিয় তাঁর এই শিশুটি। এর প্রতি তাঁর আশ্চর্য টান। ও সামনে এলে বুকের মধ্যে কেমন এক উতরোল। ওকে একবেলা না দেখলে মন আনচান। তাঁর তিন ছেলে এক মেয়ে - তাদের জন্ম, তাদের শৈশব, তাদের প্রতি স্নেহ মায়া মমতা - তাদের ক্রমশঃ বড় হয়ে ওঠার দীর্ঘ পথে কত সুখ, কত ব্যথা বেদনা - সব মিলিয়ে কাটিয়ে এসেছেন এই দীর্ঘ জীবন।

এরপর তাদের সন্তান - নাতি নাতনি মিলে সাতজন। বড় নাতি কুড়িতে পড়ল। বড় নাতনি ষোলোয় পা। সকলকেই ভালোবাসেন তিনি। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে এ এক বিচিত্র সুখানুভব এই শিশুটিকে ঘিরে। ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে তিনি দিশাহারা। অবশেষে একদিন টি. ভি. তে ডিসকভারি চ্যানেল দেখতে দেখতে একটু যেন সুত্র খুঁজে পেলেন। পৃথিবী জুড়ে কত প্রাণীর সন্তান ধারণ, প্রতিপালন - এসব দেখাচ্ছিল। প্রতিটি প্রাণীই তার প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। একটি পেঙ্গুইনও তার সন্তানকে ঠিক চিনতে পারে। একটি কুমিরও তার ছানাকে প্রতিপালন করে যতদিন না সে নিজে খাদ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। একটি পাখিও মুখে করে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে শাবকের জন্য, যদিও তার নিজের পেটে ক্ষুধা তবুও সে খায় না, শাবকদের মুখে তুলে দেয়, তারপর পুনরায় উড়ে যায় নিজের খাদ্য অন্বেষণে।এরকম কতশতসহস্র প্রাণীর প্রজন্মের পর প্রজন্ম চলেছে

জীবনধারা। এটাই বায়োলজিক্যাল ধর্ম। কিন্তু প্রকৃতি এই ধর্ম পালনের জন্য প্রাণীদের মধ্যে নিষিক্ত করেছে অপত্যস্নেহ। প্রকৃতি বাধ্য করেছে এই কর্মপালনে। নাহলে বেঁচে থাকবে না প্রাণের ধারাবাহিকতা।

.... আমি নিজেই কি কঠিন পরিশ্রম করেছি। কতভাবে নিজেকে বঞ্চিত করেও সন্তানদের লালন পালন করেছি.... আসলে প্রকৃতি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে অপত্যস্নেহ, আমাকে বাধ্য করেছে...

এভাবে নিজেকে নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছে এই শিশু তাঁর দেখা শেষ প্রজন্ম যে ভবিষ্যতে তাঁর পরিবারের আর সকলের পরেও অনেকদিন ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে তাঁর বংশধারা, সেই স্বার্থেই তাঁর মনের মধ্যে প্রকৃতি সম্ভবত বপন করেছে এই অনুভব। এরকমই একটা থিয়োরি মনে মনে গেঁথে তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন।

এতসব কথা বলার জন্য তাঁর এক বন্ধু আছে - ওই দেবদারু। সকাল বিকাল সন্ধ্যা - যখনই তিনি তাঁর প্রিয় জানালার ধারে বসে থাকেন তখনই মনে মনে ওর সাথে অনেক কথা বলেন, অনেক স্মৃতিচারণ করেন। এই প্রিয় বন্ধুটি তাঁর চেয়ে পাঁচ-ছ বছরের ছোট। চারা অবস্থায় ওকে এনেছিলেন যখন তিনি বালক। ওই বয়সের কথা কারো কিছুই মনে থাকেনা, তাঁরও নেই, কিন্তু এই ঘটনা মনে রয়েই গেছে কারন ও যে বেড়ে উঠেছে তাঁরই পাশাপাশি। তাঁর সারা জীবনের সুখ-দুঃখের সাক্ষী ও সাথী ওই বৃক্ষ।

ওকে এনেছিলেন ঘাটশিলা থেকে। ঘাটশিলায় বাবার এক বন্ধু ছিলেন - কালিদাসবাবু। সেখানে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাওয়া হতো। স্টেশন থেকে বেশ দূরে সেই গ্রাম। এক শীর্ণ জলধারা সেই গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। ছোট বড় সব পাথরের পাশ দিয়ে, ফাঁক দিয়ে। একটা বাঁধানো সাঁকো ছিল, তার ওপর দিয়ে চলত গরুর গাড়ি। বাড়িটা একতলা, লাল রঙের। একটু উঁচু মতো জায়গায় ছিল বাড়িটা, অনেকটা দূর থেকে দেখা যেত। বাড়ির

কাছে ছিল বিরাট একটা গাছ, কি যেন গাছ ঠিক মনে পড়েনা। শেষ বার যাওয়া স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে। তারপর বাবা মারা যান। তখন সবে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন। তখন জীবন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো। কি কঠিন পরিশ্রমের জীবন। চাকরি করেছেন, আবার পড়াশোনাও চালিয়ে গেছেন।

জানলার ধারে মূর্তির মতো বসেছিলেন তিনি। দৃষ্টি নিবদ্ধ ওই দেবদারুর শরীরে। এ যেন কলকাতা শহরের গিজগিজ করা বাড়ি বোঝাই এক পাড়া নয়, তিনি যেন বসে আছেন ঘাটশিলার সেই লালবাড়ির জানলার ধারে। বাড়ি থেকে বেরোলেই লাল মাটির পথ ধরে চলে যাওয়া যাবে ওই সাঁকোর কাছে, সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যাবে নীচে বয়ে যাওয়া তিরতির জলস্রোত। কিংবা সাঁকোর পাশ দিয়ে নেমে গেলে এ পাথর ডিঙিয়ে ও পাথর এড়িয়ে চলে যাওয়া যাবে জলস্রোতের কাছে, হাত ডুবিয়ে দেওয়া যাবে শীতল জলধারায়। চারপাশ নিঝুম, হয়তবা একটা পাখির ডাক....

বড় বউমা চা ও জলখাবার টেবিলে রাখলে তাঁর চমক ভাঙল।

- তুলি কোথায়? তোমাকে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে নীচে নামতে হলো?

- তুলি আছে, আমি নিজেই নামলাম একটা দরকারে। আপনার সঙ্গে একটা আলোচনা আছে। আপনি খেয়ে নিন - বলতে বলতে বিছানার একপাশে বসল বড় বউমা।

তাঁর স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে বড় বউমাই এই সংসারের সব দায়ীত্বে। সেও হয়ে গেল দেখতে দেখতে বছর দশেক।

- মেজ কদিন ধরে ফোন করে বলছিল আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে - বলল বড় বউমা।

মেজ - মানে তাঁর মেজছেলে। তার চাকুরী ক্ষেত্র এলাহাবাদ। ওখানেই পরিবার নিয়ে ভাড়া থাকে সে।

- কি বলছিল?

-বলছিল যদিও ওর চাকরি পাঁচ বছর আরও আছে কিন্তু কোম্পানি কিছু লোককে আগেই রিটায়ার করাতে চায়। তাহলে ওরা কলকাতায় চলে আসবে। এখানে এবাড়িতে কিভাবে সকলের সঙ্কুলান হবে?

একটু চুপচাপ। ভাবছেন তিনি। তিনি কি করবেন? চায়ে চুমুক দিলেন।

- আপনার বড় ছেলে তো চাকরি ছাড়া আর কিছুতেই নেই। তারও তো চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে।

- আমিতো এতসব ভেবে দেখিনি - অসহায় ভাবে বললেন তিনি। মাথায় যেন গুরুভার চাপিয়ে দিল বড় বউমা।

- এই বয়সে আপনি কেন ভাববেন।

- তা তোমরা কিছু ভেবেছ? - যেন থই পেলেন।

- রাস্তার ওপারে ওই দিকে যে ফ্ল্যাট বাড়িটা হচ্ছে ওর প্রোমোটার এ পাড়ারই লোক। উনি আপনার বড় ছেলেকে বলেছেন আমাদের বাড়িটা সঙ্গের খালি জমি সমেত অনেকটাই। এখানে ফ্যাট করলে এক এক তলায় চারটি করে ফ্ল্যাট হলে জি প্লাস ফোর - মানে কুড়ি টা ফ্ল্যাট হবে। আমরা চারটে ফ্ল্যাট পেতেই পারি। বলেছেন বেশ বড় বড় ফ্ল্যাটই দেবেন আমাদের। তা আপনার বড় ছেলে তো কিছুতেই নেই, বলল আপনার সঙ্গে কথা বলতে।

- আমাদের কত টাকা দিতে হবে?

- কিচ্ছু না। উনি বলেছেন তিন মাসের মধ্যে আমাদের চারটে ফ্ল্যাট রেডি করে দেবেন। এই তিন মাসের জন্য একটা ভাড়া বাড়ি উনিই ব্যবস্থা করে দেবেন, তার ভাড়া উনিই দেবেন।

- বল কি! এ্যাতো? - উনি অবাক।

- ওই রকমই নিয়ম। - বড় বউমা বলল।

- ভালই তো - উনি হাঁফ ছাড়লেন। গুরুভার চাপিয়ে আবার নিজেই নামিয়ে

নিল বড় বউমা, যেন জ্বর উঠে জ্বর নেমে গেল।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, বউমা কাপ প্লেট সব তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভাবলেন - বড় বৌমা সত্যিই খুব গুছোনো মেয়ে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে গিয়ে সহসা দেবদারুর দিকে দৃষ্টি তাঁর - ও কি? ওর কি হবে? ওরা তো বাড়ি সমেত জায়গাটি নেবে বলল, আমার এত দিনের বন্ধু - তিনি বড় উতলা হয়ে উঠলেন - কি হবে? ওর কি হবে?

ইদানিং তিনি গাছটির প্রতি বড় বেশি আন্তরিক হয়ে উঠেছেন। যার হাত ধরে গড়ে উঠেছিল সংসার সেই সুখ দুঃখের সাথী স্ত্রী চলে গেছে কতদিন। বন্ধু বান্ধব প্রায় সকলেই চলে গেছে। দু এক জন যাও বা আছে কাচাকাছি নয়। এখন দেবদারু তাঁর বন্ধু। অনেক সময় তার সাথে মনে মনে কথা বলেন, অনেক পুরোনো দিনের কথা, সুখদুঃখের কথা।

সেই ছবছর বয়সে প্রথম যেবার ঘাটশিলা যাওয়া - সে যে কি আনন্দ! সেই প্রথম রেলগাড়ীতে চাপা। স্টেশনে নেমে গরুর গাড়িতে করে যাওয়া লাল মাটির পথ দিয়ে। গরুর গাড়ি চাপাও সেই প্রথম। কত কৌতূহল। এই সব মনে থাকার কথা নয়, কিন্তু অনেক দিন ধরে চর্বিত চর্বন করে করে ছবিগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে মনের মধ্যে। বাবার সঙ্গে নদীর ধারে ধারে ঘোরা। তার বয়সী ছেলেরা হুড়োহুড়ি করে নদীতে চান করে। গামছা ছেঁকে মাছ ধরে। সেখানে একদিন বাবা নামতে দিয়েছিলেন। সে কি আনন্দ!

সেখানে সেই ছোট্ট পাহাড়ি নদীর ধারে ঘুরতে ঘুরতে সতেজ চারা গাছটি দেখে বালকটির মনে কি কৌতুহল জেগেছিল কে জানে!

- এটা কি গাছ বাবা?

- এটা দেবদারু।

- ওই যে সোজা লম্বা লম্বা বিরাট গাছ, ওগুলো?

- হ্যাঁ।

- কি সুন্দর গাছটা, তুলে নিয়ে যাবো? আমাদের বাগানে বসাবো?

বাবা হেসেই অস্থির, কিন্তু সে নাছোড়। অতএব তার বায়নায় বাবা গাছটি অনেকটা মাটি সমেত তুলে একটা টবে বসিয়ে এনেছিলেন, যত্ন করে বসিয়েছিলেন।

বাড়ির এই খোলা জমিটুকুতে বাবা লাউ মাচা পুঁই মাচা দুচারটে লঙ্কা গাছ দুচারটে বেগুন গাছ এসব বসাতেন। তখন চারদিক অনেক ফাঁকা ফাঁকা। একটু গ্রাম্য ভাবও ছিল। বাবা মারা যাবার পর সেসব আর থাকেনি। যে কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে নিজেকে বেঁধেছিলেন! নিত্যদিন, এমনকি ছুটির দিনেও ওভারটাইম খেটেছেন কিছু অতিরিক্ত আয়ের জন্য। তার সঙ্গে পড়াশোনা চাকরির উন্নতির জন্য। পরে পরে জায়গাটা হয়ে উঠেছিল ছেলেমেয়েদের খেলার জায়গা, দেবদারু তাদের লুকোচুরি খেলার বুড়ি!

কিন্তু এখন কি হবে? ওকে বলিদান দিয়ে শুরু হবে আমাদের স্বার্থসিদ্ধি। আচ্ছ ওদের বললে হয় না জায়গাটা বাদ দিয়ে নিতে? কিন্তু তাহলে কটা ফ্ল্যাটই বা হবে! ওদের পোষাবে কেন।

কদিন ধরে চিন্তায় চিন্তায় তিনি অস্থির। তারই মধ্যে ওদের লোকজন মাপজোক করে গেল। তাঁকে দিয়ে বড়বউমা কয়েকটি কাগজপত্র সই করিয়ে নিলো, তিনি না করতে পারলেন না। বিকেল বেলায় চিকন যখন ট্রাই সাইকেল নিয়ে খেলায় ডাকে তিনি ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারেননা।
অথচ আগে সাগ্রহে চলে যেতেন, গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াতেন, কখনো গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, কেমন শিহরণ লাগত হাতে। কিন্তু এখন কেমন করে -

ভাল করে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, সারাক্ষণ এক অস্থিরতা। সেদিন সকালে গুড মর্নিং করতে এসে চিকন দেখল দাদু বাথরুমের দরজার কাছে পড়ে আছে।

- মা - চিৎকার করে উঠল চিকন - দাদু পড়ে গেছে, কথা বলছে না। ছোট

বউমার হাঁকডাক - সকলের ছুটে আসা - হাঁকডাক - নার্সিংহোম - জ্ঞান পিরল বেলা এগারোটায়। ভোরবেলা বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে যেতে গিয়ে মাথা ঘুরে গিয়েছিল, তারপর আর কিছু মনে নেই।

ডাক্তারবাবু বললেন - মনে হয় গ্যাস থেকে হয়েছে, রাতে হয়তো ঘুম হয়নি, যাই হোক সবকিছু পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল, হার্টের ব্যাপার কিনা -

যাই হোক খারাপ কিছু পাওয়া গেলনা। তবু পাঁচ দিন রাখা হলো পর্যবেক্ষণে। সাবধানের মার নেই। পাঁচ দিন ধরে তিনি দেখলেন সকলের উদ্বেগ, আকুলতা। ছোট্ট চিকন নাকি খুব কেঁদেছে - শুনে তাঁর কি কষ্ট। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন এক তৃপ্তি, সকলের ভালবাসা পাওয়ার তৃপ্তি। শরীরটাও বেশ তরতাজা লাগছে।

তবু মাত্র পাঁচ দিন পরে চিকনের হাত ধরে নিজের ঘরে প্রবেশ করে কি যে তৃপ্তি! মনে হচ্ছে কত দীর্ঘদিন যেন ঘরছাড়া ছিলেন। জানালার কাছে তাঁর প্রিয় চেয়ারটাতে বসলেন, বড় আারাম পেলেন।

কিন্তু ওকি? দৃষ্টির সামনে কেন খোলা আকাশ? ত্রস্তে উঠলেন তিনি, জানলার ওপর ঝুঁকে পড়লেন।

- এ কি? আমার গাছ কোথায়? আমার দেবদারু? - তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

ঘরে প্রায় সবাই এসে দাঁড়িয়েছে, এরা কেউ জানেনা তাঁর মনের সাথীর কথা। কখনো তো তিনি ব্যাক্ত করেননি কারো কাছে।

- প্রোমোটারকে দায়ীত্ব দেওয়া হয়ে গেছে, আপনি তো অনুমতি দিয়েছেন - মৃদু গলায় বলল বড়বৌমা - উনি ফাঁকা জায়গাটায় আগে কাজ শুরু করবেন, তাই -

- ওঃ! - বলে ধপ করে বসে পড়লেন।

- আপনার কি আবার শরীর খারাপ লাগছে বাবা? - বড়বৌমা উতলা হয়ে পড়ে।- না না - আস্তে আস্তে বললেন, তিনি জানেন বড়বৌমার ভালবাসায়

কোনো খাদ নেই।

- তুমি নাহয় শুয়ে পড় - বলল বড় ছেলে।

- না না ঠিক আছে।

হতভম্ব চিকন দাদুর হাতটা আঁকড়ে ধরল - তুমি কি আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে? - ভীত গলায় বলল সে।

- না রে না - পরম স্নেহে তিনি নাতিকে কাছে টেনে নিলেন - আমি ঠিক আছি, আমার জন্য তুমি আজ যখন স্কুল কামাই করলে তখন এসো একটু ডিসকভারি চ্যানেল দেখা যাক।

টি.ভি. চালালেন তিনি, সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু আজ ডিসকাভারি চ্যানেলেও বৃক্ষ নিধন। সরলবর্গীয় বৃক্ষের অরণ্যে দেখ যান্ত্রিক করাত চালিয়ে কত সহজে মানুষ ধরাশায়ী করছে দীর্ঘদেহ গাছেদের। তিনি টি.ভি. বন্ধ করে দিলেন।

- কি হলো? - বলল চিকন।

- চলো একটু বাগানে যাওয়া যাক - বললেন। আসলে তাঁর মন ছটফট করছিল। বড় কষ্ট বুকের মধ্যে।.... কতদিন....কতরাত....জীবনভর শুনেছি তার মর্মর আলাপ....বাতাসে ভাসছে তার ফিসফিস স্বর...

ওদিকে দরজা খুলে জমিতে পা দিলেন।

বধ্যভূমি। বৃক্ষের চিহ্নটুকুও নেই। সব নিয়ে চলে গেছে। এমনকি গোড়া থেকে খুঁড়ে তুলে নিয়ে গেছে শেষ কাণ্ডটুকু। গর্তটাও বুজিয়ে দিয়েছে। চিহ্ন শুধু চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা কিছু শুকনো পাতা।

.... ভালই হয়েছে। খণ্ডবিখণ্ড দেহটা দেখলে আরও কষ্ট হতে...বাতাসে কান পাতলে শোনা যাবে শেষ আর্তনাদ! - ভাবনার মধ্যে নিমজ্জিত তিনি।

- এখানে আর সাইকেল চালানো যাবেনা দাদু - বলল চিকন, এখানে তো বাড়ি হয়ে যাবে। একধারে রাখা সাইকেলটা নিয়ে চালাতে শুরু করল। পাক

দিচ্ছে বারবার, যেন শেষবার চেপে নিচ্ছে। অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলেন... আমার বংশধর, ওর পরের প্রজন্ম দেখব না আমি....কিন্তু ও রেখে যাবে আরেক প্রজন্ম....

সহসা বুকের মধ্যে ফুঁপিয়ে উঠল ব্যথা...বন্ধু, অভিমন্যুর মতো তোমাকে ঘিরে সকলে মিলে তোমায় মারল ওরা, কিন্তু অবিমন্যুতো রেখে গিয়েছিল তার সন্তান পরিক্ষিৎকে, তুমি রেখে যেতে পারলে না কোনো বংশধর। আমি, আমি-ই মহা অপরাধী, তোমাকে আমি তুলে এনেছিলাম প্রকৃতির সেই পরিবেশ থেকে, যে অরণ্য পরিবেশে অনায়াসে রেখে যেতে পারতে তোমার বংশধর।

চিকন ঘুরেই চলেছে, ওকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

- দাদু, দশবার ঘুরলাম, আরও ঘুরব।

....জীবনচক্রে ঘুরে চলে, আমার অন্তর....আমি আর ঘুরতে পারবনা জীবনের পথ....ঘোরো শিশু.... তোমাকে ঘুরতে হবে অনেক পথ....

চোখ বুজিয়ে নেন তিনি। চিকন সাইকেল থামিয়ে কি যেন দেখছে। নেমে পড়ল, হাঁটু মুড়ে বসল।

- দাদু দাদু, এদিকে এসো - ব্যগ্র গলায় ডাকল চিকন।

- কি হলো? - তিনি এগিয়ে গেলেন।

- দেখতো, এটা মনে হচ্ছে তোমার সেই দেবদারুর চারা, পাতাগুলো দেখ।

কম্পিত পায়ে বসে পড়লেন তিনি, দুহাতে চোখ মুছে দেখতে চাইলেন - হ্যাঁ, তাইতো -সোৎসাহে বললেন।

সাত আটটা পাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে চারা গাছটি বহন করছে তার পরিচয়, চিকন একটি পাতা আলতো করে ধরে।

- সাবধান - বললেন তিনি - ওটা যেন ছিঁড়ে ফেলোনা।

- ছিঁড়ব কেন, তুমি ওই বাড়ি তৈরির লোকেদের বারণ করে দিও ছিঁড়ে না ফেলে। ও তো একধারে রয়েছে। - একটু চুপ করে থেকে বলল – তোমার

বড় কষ্ট হয়েছে, না দাদু? আমি জানি তুমি গাছটাকে বড্ড ভালবাসতে, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে, যেমন আমাকে করো।

- বাবা, বারোটা বাজে - দোতলার বারান্দা থেকে বলল বড় বৌমা, - ভাত খেয়ে নিন। ডাক্তারবাবু আপনাকে দুপুরে বারোটায় আর রাতে নটায় খেয়ে নিতে বলেছেন, চলে আসুন, চিকন তুমিও চলে এসো।

সারাটা দিন কাটল তার গভীর বিষাদে আর এলোমেলো ভাবনায়। বিকালে রোজ তিনি হাঁটতে বের হন, আজও অভ্যাস মতো বেরিয়ে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে কখন যেন পৌঁছে গেলেন বাজারে। পৌঁছে ভাবলেন - এখানে কেন এলাম? - দেখলেন ' মাটির সংসার ' নামক দোকানটির সামনে তিনি দাঁড়িয়ে।

- হ্যাঁ, একটা কাজ, তাইতো! ঠিকই এসেছি - ভাবলেন, দোকানে ঢুকে পড়লেন। একটা ছোট টব কিনলেন, তারপর হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে একটা খুরপি কিনলেন। সারাদিনের এলোমেলো চিন্তাগুলি মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে নিজেই বুঝতে পারেননি। দ্রুত পায়ে বাড়ি চলে এলেন।

বাড়ি ফিরে সোজা বাগানে। দেবদারুর চারাটি অতি সাবধানে অনেকটা মাটি সমেত তুলে টবে রাখলেন, চারপাশে আরও মাটি দিলেন। ভাবনা হচ্ছিল মাটি না ঝরে যায়। না, তিনি বেশ সুষ্ঠুভাবে কাজটি করতে পেরেছেন দেখে স্বস্তি বোধ করলেন।

টবটি ঘরে এনে এক কোনে রাখলেন, জল দিলেন।

রাতে এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়েন তিনি। চার পাঁচ ঘন্টার বেশি ঘুম হয়না। চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙলেও শুয়ে থাকেন চুপচাপ। এপাশ ওপাশ করেন। চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙলেও শুয়ে থাকেন চুপচাপ। এপাশ ওপাশ করে আরও ঘন্টা খানেক কাটিয়ে উঠে পড়েন। আজ বড়বৌমার অর্ডার - দশটায় খেয়ে ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। নীচে এসে কিন্তু ট্যাবলেট খেলেন না। ঘুম আসবে, ডাক্তারবাবু একটা মন্ত্র দিয়েছেন - একশ

থেকে উল্টো দিকে গোনা - চার পাঁচ ঘন্টার বেশি ঘুম হবেনা।

ঘুম ভাঙল তিনটের সময়। সাবধানে প্রায় নিঃশব্দে বাথরুমে। আজ আর স্নান নয়। একটা কাপড়ের ব্যাগে টবটি বসিয়ে একটা পাজামা পাঞ্জাবি আর গামছা দিয়ে টবটি মজবুত ভাবে বসালেন, জামা প্যান্ট পরে বেরোলেন। নীচে ওপাশের ঘরে শোয় বড় নাতি, ওর ঘুম খুব গাঢ়। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরোলেন, সাবধানে ভেজিয়ে দিলেন, তারপর দ্রুত পায়ে। একটু এগিয়ে এসে পিছন ফিরে দেখলেন শুনশান রাস্তা, হাঁফ ছাড়লেন। সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। জানেন, মোড়ে এসময় ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। যখন কর্মজীবনে ছিলেন তখন এভাবে কখনো কখনো ভোরে বেরিয়ে ট্রেন ধরে বাইরে কাজে যেতে হতে।

হ্যাঁ, ট্যাক্সি আছে একটা, ওইতো আরেকটা এসে দাঁড়াল। হাওড়া স্টেশন যাবো ভাই - বললেন। ট্যাক্সিতে উঠে ব্যাগটা ভাল করে গুছিয়ে কোলে নিয়ে বসলেন, যেমন চিকনকে কোলে নিয়ে বসতেন। ভোরে ট্রেন আছে, তিনি জানেন।

ঘাটশিলা পৌঁছলেন বেলা এগারোটায়, কতদিন পর আসা, বুক ভরে শ্বাস নিলেন। ওভারব্রিজ এ উঠে একটু দাঁড়ালেন, চারপাশ তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। এদিকে জনবসতি বেশ বেড়েছে। অনেক বাড়িঘর। একটা ফ্লাই ওভার হয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু অপর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন, ওদিকে সামান্য দূর থেকেই গাছপালা আর দূরে নীল পাহাড়ের সারি সেই পুরোনো দিনের মতোই! আরও দূরে আবছা পাহাড়ের সারি রহস্যময় যেন হাতছানি দেয়।

বাঃ - অস্ফুটে বললেন। কিন্তু তিনি যাবেন কোথায়? সেই গ্রামে? যেখানে বাবার সাথে আসতেন? যেখান থেকে সেই ছেলেবেলায় এমন করেই নিয়ে গিয়েছিলেন সেই শিশু দেবদারু সেখানেই কি ফেরৎ দেবেন? কিন্তু কি সেই গ্রামের নাম? এতসব না ভেবেই বেরিয়েছেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন

সেই গ্রামের নামটি।

' হরিণ ' কথাটা মনে আছে কারন ওটা ভোলবার নয়, কিন্তু হরিণ কি যেন –

বাইরে এসে কয়েকটি সাইকেল রিক্সা দেখলেন, একজনের কাছে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করলেন - একটা গ্রামে যাবো, নামটা কি যেন - হরিণ -

- হরিন দুকড়ি? - একগাল হেসে বলল রিক্সাওয়ালা।

- হ্যাঁ হ্যাঁ - সানন্দে বললেন।

রাস্তার দুপাশে অনেক বাড়ি হয়েছে। কে জানে কেমন আছে সেই গ্রাম! ভাবতে ভাবতেই ক্রমশঃ ফাঁকা তারপর সেই পুরনো দিনের পরিবেশ। রাস্তাটা শুধু একটু চওড়া আর ভাল হয়েছে।

একটা প্রাইমারি স্কুল - এটা নতুন হয়েছে। ছেলেমেয়েদের কলরব - পেরিয়ে গেলেন। তারপর ওই দূর থেকে দেখা যায় সেই একতলা লাল বাড়ি বড়ই মলিন ও ধূসর, আর সেই বিশাল গাছটা - ঠিক তেমনই আছে। তাঁর বুকটা কেমন করে উঠল, বাড়িটা বন্ধ মনে হচ্ছে সব?

- একটু দাঁড়াওতো ভাই - বললেন তিনি। রিক্সাওয়ালা দাঁড়াল, পিছন ফিরে তাকাল - তিনি তাকিয়ে আছেন বাড়িটার দিকে।

- ওখানে যাবেন? ওই বাড়িতে? কিন্তু ওখানে তো কেউ নেই, অনেকদিন বন্ধ পড়ে আছে।

- না, ওখানে নয় - আনমনে বললেন তিনি - আরেকটু চলো, সেই যে একটা সাঁকো আছে, ছোট্ট নদী -

রিক্সা গতি নিলো।

সেই সাঁকো! তেমনই। নামলেন। বুকে কেমন এক উত্তেজনা। নীচে তাকালেন, দেখো! ছেলেরা কেমন চান করছে! ঠিক সেই আগের দিনের

মতো! হেসে ফেললেন। নামলেন, সাবধানে ব্যাগ নামালেন, পকেট থেকে একশ টাকা বার করে রিক্সাওয়ালাকে দিলেন, বললেন - তুমি একটু থাকো এখানে, আমি আবার ফিরব, আরও টাকা দোবো, ভেব না।

সাঁকোর পাশ দিয়ে নেমে গেছে পায়ে চলা পথ - সাবধানে নামতে লাগলেন, তারপর নদীর ধার দিয়ে এগিয়ে চললেন। ব্যাগটা বেশ ভারি লাগছে। উঁচু নীচু পথ, কখনো পাথরের চাঁই, কখনো ভিজে নরম মাটি, হাঁফ লাগছে। অবশেষে একটু ফাঁকা মতো জায়গা - উঠে এলেন, বেশ কষ্ট, হাঁফাতে হাঁফাতে বসে পড়লেন।

কি নিঝুম চরাচর! কি একটা পাখি ডেকে ডেকে উড়ে গেল। কান পাতলে জলধারার শব্দ পাওয়া যায়। আকাশ কি গভীর নীল! বাতাস কি পরিস্কার! দীর্ঘ শ্বাস নিলেন। তৃষ্ণায় গলাটা শুকনো লাগছে। ব্যাগ থেকে জলের বোতল বার করলেন। ট্রেনে কিছু খাবার কিনে খেয়েছিলেন, আর জলের বোতল - জল খেলেন।

- এবার কাজ শুরু করা যাক - ভাবলেন।

খুপরি দিয়ে গর্ত খুঁড়তে বেশ পরিশ্রম, হাঁফিয়ে যাচ্ছেন, একটু থামলেন, আবার - এভাবে গর্ত খোঁড়া হলে টবটির নীচে খুপরির আঘাত দিয়ে ভেঙে ফেললেন, মাটি সমেত গাছটি বসিয়ে দিলেন, চারপাশে মাটি দিলেন।

টবের ধারগুলি ভেঙে ভেঙে বার করে নিলেন। ভয় হচ্ছিল টবের মাটিটা না আলগা হয়ে যায়। কিন্তু না, কাজটা বেশ ভালভাবেই করা গেছে। আরও ভালভাবে মাটি দিয়ে বোতলের জলটুকু ঢেলে দিলেন। আরো জল চাই, নেমে গেলেন নদীতে, বোতল ভরে এনে ঢাললেন। খুবই হাঁফাচ্ছেন, কী ভীষণ বুক ধড়ফড় করছে।

আসনে বসার মতো বসলেন গাছটির সামনে, যেন পূজার্চনায় বসেছেন, পর্যবেক্ষণ করছেন গাছটিকে, মৃদু বাতাসে পাতাগুলি কাঁপছে। ও

কি তৃপ্তি বোধ করছে এই পরিচ্ছন্ন বাতাসের সংস্পর্শে এসে? কেমন এক আবেগ তাঁর বুক ঠেলে উঠে আসছে। আকাশের দিকে তাকালেন, একবার নদীর দিকে -

.....হে নদী, তুমি মাটির হাতে হাতে পাঠিয়ে দিও স্নিগ্ধ জল এই দেবশিশুর জন্য... হে রৌদ্র, তুমি ওকে দিও পরিমিত উত্তাপ সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য....হে বাতাস, তুমি ওকে দিও পরিমল প্রাণবায়ু....হে মাটি, তুমি ওকে দিও প্রাণধারণের খাদ্য....।

কি আবেগের স্রোত বুকের মধ্যে, এসব কথা বলছিলেন - যেন মৃদুস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ....

বড় ক্লান্তি। মনে হচ্ছে একটু শুয়ে পড়ি.... চোখ বুজে আসছে....দূর থেকে ভেসে আসছে ও কি চিকনের কণ্ঠস্বর.... না কি পাখি ডাকছে...

–

–